খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিকতা এবং সামাজিক গুরুত্ব
(The Aesthetic and Social Importance of the Art of Needlework from the Khulna Division)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ, প্রাচ্যকলা বিভাগে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির
প্রাচ্যকলা বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার
অনারারি অধ্যাপক
প্রাচ্যকলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক:
খায়রুস্ মালিহা
ক্রমিক নম্বর: ০০১
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৫৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

মা-বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ

ও

বাবা-মোঃ বদরুদ্দোজা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সূচিশিল্পের সাথে আমার পরিচয় শৈশব থেকেই। গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে, অবসর সময়ে মা সূচিকাজ করছেন দেখেই শৈশব, কৈশর পার হয়েছে। ছবি আঁকার হাত ভাল থাকায় মাধ্যমিক শ্রেণি থেকেই মা-এর সূচিকাজের নকশা অঙ্কনে ও সূচিশিল্প সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা, হাতে হাতে কাজ করার মধ্যে থেকেই সূচিশিল্পের প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। চারু ও কারুশিল্পের প্রতি ভালোলাগা থেকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ বর্তমান গভর্নমেন্ট কলেজ অব এ্যাপ্লাইড হিউম্যান সাইন্স থেকে শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগে বি.এসসি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করি। যেখানে সূচিশিল্প বিষয়টি চতুর্থ বর্ষের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। সূচিশিল্প সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা ও শিল্পকলার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার আগ্রহ থেকে এবং নিজ এলাকার সূচিশিল্পীদের কর্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর অবদান সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ তাগিদ অনুভব করি। তাই গবেষণার মাধ্যমে খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের চালচিত্র তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেই।

আমার গবেষণার শিরোনাম 'খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিকতা এবং সামাজিক গুরুত্ব'। আমার এই গবেষণায় তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ, প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির স্যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেছেন, আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদ, প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার স্যার–এর অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ আমাকে উপকৃত করেছে, আমি তাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব কান্তিদেব অধিকারী, অধ্যাপক ড. মলয় বালা, অধ্যাপক ড. সুশান্ত কুমার অধিকারী, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. আব্দুল আযীয ও সহকারী অধ্যাপক জনাব গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী, সহকারী অধ্যাপক জনাব দীপ্তি রানী দত্ত, সহকারী অধ্যাপক জনাব সুমন কুমার বৈদ্য, সহকারী অধ্যাপক জনাব অমিত নন্দী-নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাচ্যকলা বিভাগের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব মো. মারুফ হোসেন, লাইব্রেরি সহকারী জনাব প্রদীপ কুমার আইচ সহ যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শিক্ষক শিল্পকলা ও সৃজনশীল শিক্ষা বিভাগ, গভর্নমেন্ট কলেজ অব এ্যাপ্লাইড হিউম্যান সায়েন্স (তৎকালীন গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, আজিমপুর), অধ্যাপক রাজিয়া বেগম- এর নিকট যিনি আমাকে এই গবেষণায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করেছেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি

জনাব মো. মাকসুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্যারের নিকট যিনি আমাকে বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠান দুর্লভ চিত্র ও প্রকাশিত পুস্তকের মাধ্যমে নানা তথ্য পেতে সহযোগিতা করেছে তার মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর-সোনারগাঁও, বাংলা একাডেমি, চারুকলা অনুষদ গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) ঢাকা, সাতক্ষীরা মহিলা সংস্থা, ঋ–শিল্পী (আন্তর্জাতিক সংস্থা), ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ছোঁয়া হস্তশিল্প, সুঁই- ফোঁড় বুটিকস এন্ড ট্রেইনিং সেন্টার এবং সৃষ্টি হস্তশিল্প এন্ড বুটিকস।

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আলোকচিত্র ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহের ক্ষেত্রে ও প্রদানের মাধ্যমে যাঁরা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন– জনাব শামসুর রহমান, জনাব জাহানারা বেগম, জনাব শহিদুল ইসলাম, জনাব জাহিদুল ইসলাম, জনাব সেলিনা বেগম, জাকিয়া–এ–জাহান সুপ্তি, দিবা ইসলাম, তটিনি এলিজাবেথ সাহা, করুণা সাহা, মর্জিনা রহমান, রাফিয়া, রুবিনা আক্তার আইভি, মহুয়া আক্তার তামান্না, নূরুন নাহার লিলি, সাদিয়া ফারজানা মহুয়া, শাহানা পারভীন বেবি, ফারহানা সুলতানা মুক্তা, শাহীন সুলতানা, বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ। এদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমার পরিবারের সকল সদস্য প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে ও এই গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। আমার সহপাঠী ও শুভানুধ্যায়ী যাঁরা আমাকে মূল্যবান বই ও বিভিন্ন পত্র–পত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

.....
খায়রুস্ মালিহা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিকতা এবং সামাজিক গুরুত্ব'–শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব এবং আমার জানা মতে উক্ত বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। নকশি কাঁথা বা সূচিশিল্প নিয়ে কাজ হলেও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের সূচিকাজ সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ রচনা বা গবেষণা করা হয়নি। আমি খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার উল্লেখযোগ্য সূচিকর্ম, তার সৌন্দর্য ও সূচিশিল্পীদের সামাজিক উন্নয়নে অবদান তুলে ধরতে এবং সূচিশিল্পের মত একটি উল্লেখযোগ্য হস্তজাত শিল্প সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য এই অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভূক্ত করেছি। আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভটি কোন প্রতিষ্ঠান, সাময়িকী, ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি।

.....
খায়রুস্ মালিহা
ক্রমিক নম্বর: ০০১
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২৫৮
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এই অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে প্রস্তুত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি খায়রুস্ মালিহা–এর একক গবেষণার ফল। অন্য কেউ এর কোন প্রকার অংশীদার নয়। এটি একটি মৌলিক রচনা।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

.....
অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ফকির
প্রাচ্যকলা বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিকতা এবং সামাজিক গুরুত্ব' নামক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধায়নে প্রস্তুতকৃত। অভিসন্দর্ভটি খায়রুস্ মালিহা–এর একক গবেষণার ফল। অন্য কেউ এর কোন প্রকার অংশীদার নয়। এটি একটি মৌলিক রচনা।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

.....

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার
অনারারি অধ্যাপক
প্রাচ্যকলা বিভাগ
চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

শিল্পকলা জীবন ও বাস্তবতার এক সৃজনশীল ব্যাখ্যা। সূচিশিল্প শিল্পকলার অতি প্রাচীন একটি মাধ্যম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহারিক এবং নান্দনিক শৈল্পিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে ও সৃষ্টি করে নানা ধরনের সৃজনশীল শিল্প। সূচিশিল্প সৃজনশীল শিল্পের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও জাতির মধ্যেই সূচিশিল্পের চর্চা বিরাজমান। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক সংস্কৃতিতেও এর আবেদন সমানভাবে প্রত্যক্ষ হয়।

শিল্পকলা যে কোন দেশের অতীত সমাজকে জানতে সাহায্য করে এবং কোন বিশেষ সমাজ বা সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সূচিকর্ম সাধারণত সহজলভ্য উপকরণ দ্বারা তৈরি এবং এর নকশাগুলো যাপিত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে, অবসর সময়ে সাধারণ মানুষ তার মনের ভাব, আবেগ, অনুভূতি এবং কল্পনাকে শিল্প রসে সিক্ত করে বিভিন্ন প্রকার সূচিকর্মের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং অন্যদের নিকট নান্দনিক রূপে উপস্থাপন করে। তাই, এর মাধ্যমে দেশের ভূ–প্রকৃতি, জলবায়ু, মানুষের আর্থ–সামাজিক অবস্থা, আচার–আচরণ সবই প্রতিফলিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই শিল্প শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে কখনও তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণেও সহায়ক হয়।

বিষয় বর্ণনা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের সুখ-দুঃখ তথা মনের ভাব শিল্পকর্মের বিভিন্ন মাধ্যমে ফুটে ওঠে, সূচিশিল্প এমনই এক মাধ্যম যে শিল্পের রূপ, রস ও প্রকৃতি গার্হস্থ্য জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। নকশী কাঁথা, পোশাক-আশাক, গৃহস্থালির বিভিন্ন সামগ্রিতে শিল্পকলা জীবন ও বাস্তবতার এক সৃজনশীল ব্যাখ্যা। সূচিশিল্প শিল্পকলার অতি প্রাচীন একটি মাধ্যম। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহারিক এবং নান্দনিক শৈল্পিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে ও সৃষ্টি করে নানা ধরনের সৃজনশীল শিল্প। সূচিশিল্প সৃজনশীল শিল্পের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ ও জাতির মধ্যেই সূচিশিল্পের চর্চা বিরাজমান। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক সংস্কৃতিতেও এর আবেদন সমানভাবে প্রত্যক্ষ হয়।

শিল্পকলা যে কোন দেশের অতীত সমাজকে জানতে সাহায্য করে ও কোন বিশেষ সমাজ বা সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সূচিকর্ম সাধারণত সহজলভ্য উপকরণ দ্বারা তৈরি এবং এর নকশাগুলো যাপিত জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে, অবসর সময়ে সাধারণ মানুষ তার মনের ভাব, আবেগ, অনুভূতি এবং কল্পনাকে শিল্প রসে সিক্ত করে বিভিন্ন প্রকার সূচিকর্মের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং অন্যদের নিকট নান্দনিক রূপে উপস্থাপন করে। তাই,

এর মাধ্যমে দেশের ভূ–প্রকৃতি, জলবায়ু, মানুষের আর্থ–সামাজিক অবস্থা, আচার–আচরণ সবই প্রতিফলিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই শিল্প শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদাই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে কখনও তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণেও সহায়ক হয়।

গবেষণার লক্ষ্য

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ও ঐতিহ্যবাহী সূচিশিল্পের নান্দনিক রূপ এবং তার ব্যবহারিক দিক বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে কিভাবে গুরুত্ব বহন করছে তা নির্ণয় করা এবং এর বিকাশের অন্তরায় যে কারণগুলো আছে তা চিহ্নিত করে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য মতামত উপস্থাপন করাই এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হল–

ক. খুলনা বিভাগের প্রচলিত সূচিশিল্পের নান্দনিকতা বিশ্লেষণ;

খ. সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব নিরূপণ;

গ. দৈনন্দিন জীবনের সাথে এই শিল্পের নন্দনতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ;

ঘ. পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সূচিশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্ণয়;

ঙ. সমাজের উন্নয়নে সূচিশিল্পের ভূমিকা নিরূপণ করা;

চ. এই শিল্পের উন্নয়নের পথে বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করা;

ছ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই শিল্পকে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

গবেষণার পদ্ধতি

খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিক এবং সামাজিক গুরুত্ব শীর্ষক এই গবেষণা বাস্তবায়নের যথাযথ ও পরিপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস

ক) খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও গ্রামের ব্যক্তি, সূচিশিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে তৈরি সূচিকর্ম;

খ) বিভিন্ন লোকজ মেলা ও প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সূচিকর্ম;

গ) খুলনা বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন বিপণন কেন্দ্র;

ঘ) খুলনা বিভাগের বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান;

এছাড়াও আলোচ্য বিষয়াবলীর সাথে সংযুক্ত কর্মী এবং সনাতন ও আধুনিক শিল্পীদের শিল্পকর্ম, সাক্ষাৎকার, প্রদর্শনী, আপন শিল্পকর্ম সম্পর্কে শিল্পীর মৌখিক ও লিখিত বিবৃতি ইত্যাদি এই গবেষণার প্রাথমিক উৎস।

দ্বিতীয় পর্যায়ভূক্ত উৎস

বিভিন্ন গ্রন্থ, ক্যাটালগ, পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সূচিশিল্প বিষয়ক রচনা এবং যাদুঘর, বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংরক্ষিত সূচিশিল্পসমূহ দ্বিতীয় স্তরের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্ধতি

ক) মূলত লিখিত দলিল (প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত) থেকে তথ্যাদি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে সংরক্ষিত তথ্য বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির অন্তর্গত। কালানুক্রমিক অগ্রগতির পর্যায় নির্ণয়েও বিশেষ যত্নশীল ভূমিকা অনুসৃত হয়েছে।
খ) বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি এই গবেষণায় অন্তর্ভক্ত হয়েছে। যেমন- সরেজমিনে সূচিশিল্পের নানান বিষয়ের বিবরণ, নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ, প্রথমে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করে, বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করে তাদের অভিমত সংগ্রহ, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ উৎসব পরিদর্শন, আলোচিত্র গ্রহন ইত্যাদি এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় হস্তজাত শিল্পের মধ্যে সূচিশিল্প লোকজ ও আধুনিক ধারার সমন্বয়ে সমাজে বহুল প্রচলিত একটি শিল্প। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সূচিশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঐতিহ্যবাহী ও নান্দনিক নকশা এবং নিখুঁত কারুকাজের জন্য খুলনা বিভাগের সূচিকাজের সুনাম ও চাহিদা বিশ্বব্যাপী। 'খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নান্দনিকতা এবং সামাজিক গুরুত্ব' শীর্ষক গবেষণাটি খুলনা বিভাগ তথা বাংলাদেশের কারুশিল্প, শিল্পী, কর্মী এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে নতুন ভাবনার সঞ্চার করবে, আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং কাজের সহায়ক হবে বলে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
	ঘোষণাপত্র	iii
	প্রত্যয়নপত্র	iv
	প্রত্যয়নপত্র	v
	সারসংক্ষেপ	vi
	গবেষণার লক্ষ্য ,উদ্দেশ্য , পদ্ধতি	vii-viii
	ভূমিকা	১-২
প্রথম অধ্যায়	**বাংলাদেশের সূচিশিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ**	৩-১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**সূচিশিল্পের রূপ-বৈচিত্র**	২০-৩৩
	২.১ নকশার বিষয়বস্তু	২০-২১
	২.২ মোটিফ বিশ্লেষণ	২১-২৩
	২.৩ সূচিনকশার তাৎপর্য	২৩-২৪
	২.৪ সূচিশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ	২৪-২৬
	২.৫ সূচিশিল্পে ব্যবহৃত ফোঁড়	২৭-৩৩
	২.৬ সূচিনকশা অঙ্কন পদ্ধতি	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	**জেলাভেদে সূচিশিল্পের বৈশিষ্ট্য , প্রকারভেদ ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া**	৩৪-৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	**খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নকশার স্বরূপ বিশ্লেষণ**	৩৯-৪৭
পঞ্চম অধ্যায়	**সামাজিক উন্নয়নে খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পীদের অবদান**	৪৮-৬০
	৫.১ সমাজে সূচিকর্মীদের অবস্থান	৫৯-৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়	**খুলনা বিভাগের সূচি শিল্পীদের নান্দনিক বোধ**	৬১-৬৫
সুপারিশমালা		৬৬-৬৭
উপসংহার		৬৮
অ্যালবাম		৬৯-১০৫
চিত্রসূচী		১০৬-১১০
গ্রন্থপুঞ্জি		১১১-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি বিরাজমান। অবচেতন মনেই সবাই সুন্দরের অন্বেষণ করে। শুধুমাত্র মানুষই নয়, প্রাণীজগতের দিকেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারাও তাদের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নতুন সঙ্গীকে আকৃষ্ট করে ।

তবে, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ এক কথায় সুন্দরের কোন সংজ্ঞা নেই, নেই কোন নির্দিষ্ট আকার। সৌন্দর্যবোধ এমন একটি বিষয় যা শুধুমাত্র অনুভব করা যায়। আবার, ব্যক্তির মনস্তত্ত্বভেদেও এই সৌন্দর্যানুভূতির তারতম্য ঘটে। অবচেতন মনের এই বোধকে, সচেতনভাবে প্রকাশ এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্যবোধকে পুঁজি করে সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠতে পারলেই পাওয়া যায় সৌন্দর্যের স্বার্থকতা।

সাধারণ জীবন যাপনের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথকভাবে ভাবতে পারেন অন্যের মনের আবেগ-অনুভূতি যা জীবনের রূপ রসকে ফুটিয়ে তোলে শিল্পের ছোয়ায়। গার্হস্থ্য জীবনের খুব পরিচিত এমনই একটি শিল্প হলো সূচিশিল্প (Needlework)। বাংলাদেশের মানুষের কাছে সূচিশিল্প যতটা না শিল্প তার থেকে অনেক বেশি কর্ম। অর্থাৎ, সূচিশিল্প এদেশের ঐতিহ্যের সাথে এতটাই মিশে আছে যে, সেই অতীতকাল থেকেই এটি গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। নিত্য নৈমিত্তিক কাজের ভিতরেই গ্রাম বাংলার মেয়েরা, গৃহবধূরা সূচিকর্ম করে থাকতো। তাদের সেই অবসরের অলস সময়কে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য অনেকটা গল্পের ছলেই সৃষ্টি হতো অপূর্ব সব সূচিশিল্প। কিন্তু তা তাদের কাছে শুধুমাত্র সূচিকর্ম হিসেবেই গণ্য হতো। অন্যের করা একটু প্রশংসা ও আত্মতৃপ্তিই ছিল সেই সব শিল্পীদের পরম পাওয়া এবং এই কাজের সাথে ব্যবহারিক প্রয়োজনের ছিল প্রধান যোগসূত্র। মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনকে সামনে রেখেই সৃষ্টি হয় সূচিশিল্প। তবে, এই কর্মে যখন শিল্পীর মনের দুঃখ, কষ্ট, কল্পনা, হাসি, কান্না এবং আন্দময় বিষয়গুলো প্রতিফলিত হতে থাকে তখনই তা হয়ে উঠে শিল্পকর্ম, কিন্তু অতীতে সূচিশিল্পকে শিল্প হিসেবে সেভাবে মর্যাদা দেয়া হয়নি। কারণ, তথাকথিত শিক্ষিত বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা এর উদ্ভব ঘটেনি। খুব সহজ–সরল শ্রেণির মানুষের মাধ্যমে এর জন্ম, কিন্তু তার ভাবার্থ প্রকাশে নিরব থেকে গেছে তখনকার সমাজ ব্যবস্থা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা, দীনতা এসবই এই নিরবতার কারণ হতে পারে। আধুনিক যুগে নকশি কাঁথাকে লোকশিল্পের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নকশি কাঁথা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সূচিশিল্প তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে সাধারণত সূচিনকশাগুলো তখনকার নকশার ধরনকে অনুসরণ করেই তৈরি হয়ে থাকে। কিছু পরীক্ষামূলক কাজ হলেও দেখা যায় যে, পুরাতন মোটিফ বা ফোঁড় ও কাজের ধরন একই রেখে ভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হচ্ছে। শুধু অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে পল্লীবালার সহজ-সরল জীবনবোধ, প্রাধান্য পাচ্ছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য। সমগ্র বাংলাদেশেই সূচিশিল্পের কাজ ব্যক্তিগতভাবে বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হয়ে আসছে। দেশের যেসব অঞ্চল সূচিশিল্পের জন্য বিখ্যাত সেগুলো হলো: যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জামালপুর, ফরিদপুর ইত্যাদি। প্রাচীনকাল থেকেই যশোর জেলার নকশি কাঁথার সুনাম জগদ্‌বিখ্যাত। নকশি কাঁথায় ব্যবহৃত একটি ফোঁড়কে 'যশোর' স্টিচ বলেও অভিহিত করা হয়। সুতরাং, এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, যশোরের সূচিশিল্প সমগ্র দেশের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য। যশোরের অবস্থান খুলনা বিভাগে। তাই, যশোরের সূচিশিল্পকে কেন্দ্র করে গোটা খুলনা বিভাগেই রয়েছে সূচিশিল্পের ব্যাপক প্রসার। ১৮৮২ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনাকে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর আগে খুলনা যশোরের সাথে যুক্ত ছিল। ইংরেজ আমলে 'যশোর কালনা' (Jessore-Culna) বলা হত।[১] ১৯৬০ সালে কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর নিয়ে খুলনা বিভাগের যাত্রা হয়। ১৯৮৪ সালে খুলনা বিভাগ থেকে বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি ও বরগুনা এই ৬টি জেলাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র খুলনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, বাগেরহাট, মাগুরা, মেহেরপুর, যশোর, সাতক্ষীরা এই ১০টি জেলাকে নিয়ে খুলনা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। (চিত্র: ০১)। শিল্প সংস্কৃতিতে ঐতিহ্যময় খুলনা বিভাগ ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত। যেমন: বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উদাহরণ। ইংরেজ আমল থেকেই যশোরের নকশি কাঁথার সুনাম রয়েছে, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন চমচম ও হস্তচালিত তাঁতের জন্য বিখ্যাত কুষ্টিয়া, বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের জন্মভূমি নড়াইল। জুট মিল, মৎস ঘের, রাইস মিল, ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা, ম্যানগ্রোভ বন ও আধুনিক শহর হিসেবে বিখ্যাত খুলনা সদর, মৎস-খামার, চিংড়ির ঘের, সন্দেশ, সুন্দরবন ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত সাতক্ষীরা জেলা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে খুলনা বিভাগের সব জেলাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ঐতিহ্যমন্ডিত। তবে, হস্ত ও কারুশিল্পের দিক থেকে সূচিশিল্পের মাধ্যমে এই বিভাগ বেশ দক্ষতার ছাপ রাখছে সমগ্র বাংলাদেশে। বর্তমানে শুধু দেশেই নয়, শিল্প পিপাসু বিভিন্ন দেশেও সূচিশিল্পের কদর রয়েছে। তাই খুলনা বিভাগের সূচিশিল্প দেশের গন্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্ব-বাজারে আলাদা স্থান নিয়েছে। বিশেষ করে ইতালিতে খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের কাজ অনেক বেশি রপ্তানী হচ্ছে। আবার, যৌথ প্রচেষ্টায় সূচিনকশার আদান–প্রদানও ঘটছে এই অঞ্চলে। যশোর তার ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার ভাবমূল্যকে এখনো স্বগৌরবে টিকিয়ে রেখেছে। তাই, খুলনা বিভাগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অন্যান্য যে কোন জেলার তুলনায় সূচিশিল্পের বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়।

[১] শামজুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা খুলনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৪, পৃ: ২৩।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের সূচিশিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সূচিনকশার প্রচলন রয়েছে। ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সূচিকাজের শিল্পকে পছন্দ করে থাকে, একবিংশ শতাব্দীতেও এর বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে সূচিকাজেরও একটি স্থান রয়েছে। তাইতো যুগে যুগে সূচিকাজের উপস্থিতির আভাস পাওয়া যায় বিভিন্ন সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনে। বাংলাদেশের সূচিকাজের ইতিহাসও প্রাচীন যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চার সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলার সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ভৌগোলিকভাবে বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাস জড়িয়ে আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক উপত্যকার সাথে। প্রাচীন রোমান ও গ্রীক ভাষায় এই সমগ্র অঞ্চলের নাম হয় 'গঙ্গারিডাই'। যার অর্থ 'বাংলা গঙ্গার সম্পদ'। এটি খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ শতকের একটি রাজ্য। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে এই রাজ্যের উল্লেখ করেন।[২] (চিত্র: ০২)। যেহেতু বাংলাদেশের জন্ম হবার পূর্বেও এ ভূ-খন্ডে এর অবস্থান ছিল এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চলের সাথে সরাসরি এর যোগাযোগ ছিল সেসব অঞ্চলের সংস্কৃতির কিছু প্রভাব এখনো দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে লোকজশিল্পে বেশি দেখা যায়। তবে বর্তমান সময়ে আধুনিকতার সংমিশ্রণে এবং যান্ত্রিক উপস্থিতির ফলে হস্তজাত শিল্পের নকশার উপস্থাপন ও অংকন শৈলীর পরিবর্তন লক্ষণীয়।

এদেশের সূচিশিল্পের ইতিহাস জানতে হলে গঙ্গারিডাই রাজ্য তথা বাংলার সাথে যোগসূত্র রয়েছে এমন সব সভ্যতার নিদর্শন ও তথ্য থেকেই এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

নিম্নে দুটি পর্বে এদেশের সূচিশিল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর আলোকপাত করা হলো:

ক) প্রাক-বাংলাদেশ পর্ব

খ) বাংলাদেশ পর্ব

ক) প্রাক-বাংলাদেশ পর্ব

প্রাচীন প্রস্তর যুগ প্যালিওলিথিক সময় (৪,০০,০০০-২,০০,০০০ খ্রি. পূ.) থেকেই সুচের প্রচলন ছিল বলে ধারণা পাওয়া যায়।[৩] (চিত্র: ০৩)। যা ধীরে ধীরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক দেশ

---

[২] গঙ্গাঋদ্ধি,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%8B%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF

[৩] ধারালো সুইয়ের বিস্তৃত ইতিহাস,
https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8?amp

থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে করণকৌশল, রং ও সুচ ব্যবহারের মধ্যে একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন বাংলার সূচিশিল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাক–বাংলাদেশ পর্বকে প্রধানত ১৩টি ভাগে বিভক্ত করা হলো। যথা:

১. দক্ষিণ-এশিয় প্রস্তর যুগ (৭,০০০-৩,৩০০ খ্রি.পূ.)

২. সিন্ধু সভ্যতা ৩,৩০০-১,৩০০ খ্রি.পূ. (পূনবর্ধিত কাল ২,৬০০-১,৯০০ খ্রি. পূ.)

৩. তাম্র-প্রস্তর যুগ (১৬০০-৭৫০ খ্রি.পূ.)

৪. বৈদিক যুগ (১,৫০০-৫০০ খ্রি.পূ.)

৫. লৌহ যুগ (১,০০০ খ্রি.পূ. আনুমানিক)

৬. মহাজনপদ পর্ব (৭০০-৩০০ খ্রি.পূ.)

৭. মৌর্য সাম্রাজ্য (৩২১-১৮৪ খ্রি.পূ.)

৮. গুপ্ত যুগ (৩২০-৫৫০ খ্রি.)

৯. পাল যুগ (৭৫০-১১৭৪ খ্রি.)

১০. বাংলায় ইসলামিক অনুশাসন (১২০৪-১৬০০ খ্রি.)

১১. মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.)

১২. ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্য (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রি.)

১৩. পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.)

(১) দক্ষিণ-এশিয় প্রস্তর যুগ (৭,০০০-৩,৩০০ খ্রি. পূ.)

নব্য-প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির নিদর্শন ভারতের অধিকাংশ স্থানে কম-বেশি পাওয়া গেছে। যেমন: সিন্ধু প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পূর্ব ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। এই যুগে মানুষ পশম ও সুতি বস্ত্র বুনতে পারত।[৪] যেহেতু সুচ বস্ত্র তৈরির অন্যতম প্রধান সহায়ক অনুসঙ্গ, সেহেতু ধরে নেয়া যায় যে, বাংলায় নব্য-প্রস্তর যুগ থেকে সুচের ব্যবহার ছিল। কারণ, সুচ ছাড়া এই ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। সরাসরি সূচিকলার কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও প্রাচীন শিল্পকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন পোশাক পরিচ্ছদে কারুকার্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যা হয়তো সূচিকাজের হতে পারে।

(২) সিন্ধু সভ্যতা (৩,৩০০-১,৩০০ খ্রি. পূ; পূণর্বর্ধিতকাল ২,৬০০-১,৯০০ খ্রি. পূ.)

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা নিয়ে সিন্ধু সভ্যতা। যদিও এর অন্তর্গত ভূ-খন্ড বর্তমান পাকিস্তান, ভারতের পশ্চিমদিকের রাজ্যসমূহ, দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তান প্রদেশের পূর্ব অংশ।

[৪] ডঃ অতুল চন্দ্র রায়, সুরঞ্জনা সান্যাল, *ভারতের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ: ২০।

তারপরও এই সভ্যতার নিদর্শন বাংলার ইতিহাসের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতা। সাধারণত লোহা বা ব্রোঞ্জের সুচের ব্যবহার শুরু হয় এই যুগ থেকেই। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রি.পূ. ৩০০০ বছর আগেই এই উপত্যকার জনপদ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষতার চরম শিখরে উন্নিত হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর প্রত্ন–নিদর্শনের মধ্যে ব্রোঞ্জের সুচ এবং কিছু মূর্তির পরিচ্ছদে সূচিশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে।[৫] (চিত্রঃ ০৪)। তাই ধারণা করা যায় যে, এই সভ্যতায় সেলাই করা কাপড় পরিধানের প্রচলন ছিল। যে সভ্যতা সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত ছিল সে সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি হল তার শিল্পকলা। সূচিকলা শিল্পকলার অন্যতম একটি মাধ্যম। যা, যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রয়োজনের পাশাপাশি সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় প্রাপ্ত ভার্স্কয 'যাজক রাজা'-১৭.৫ সে.মি. লম্বা একটি পুরুষ মূর্তি, যার পরিধেয় বস্ত্রটি লাল রঙের 'ত্রিপত্র' (ল্যাটিন- Trifolium, three leaved plant) নকশায় সজ্জিত। এটি বর্তমানে পাকিস্তান জাতীয় জাদুঘর, করাচিতে সংরক্ষিত আছে। যদিও উল্লেখ নেই চাদরের নকশাটি কি মাধ্যমে করা হতে পারে, তবে যে নকশা দেখা যাচ্ছে তা সূচিনকশার মাধ্যমেও করা যেতে পারে। কারণ বর্তমানেও এমন নকশা সূচিনকশায় দেখা যায়।[৬] (চিত্রঃ ০৫)।

(৩) তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন [পাণ্ডু রাজার ঢিবি (১,৬০০-৭৫০ খ্রি. পূ.)]

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শনের মধ্যে 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি' সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এটি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের অজয় নদের তীরে বর্ধমান জেলার পান্ডুক নামক স্থানে অবস্থিত। ১৯৫৪-৫৭ সালের মধ্যে সর্বপ্রথম বি.বি. লাল কর্তৃক এবং ১৯৬২-১৯৬৫ ও ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের উদ্যোগে এই প্রত্নস্থলের উৎখনন চলে। সর্বশেষ উৎখননে সুস্পষ্ট ৬টি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২য় স্তরটিকে তাম্র-প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ধরা হচ্ছে। এই স্তরে তামার নিদর্শনের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তার মধ্যে সুচ এবং হারপূণ অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে মাটির পিন্ডের ওপর রেশমি সুতি বস্ত্রের ছাপ এবং শিমুল তুলোয় তৈরি সুতোয় বোনা কাপড়ের টুকরা।[৭] এখানে সরাসরি সুচ পাওয়া গেছে এবং অন্য যে দুটি নির্দশন পাওয়া গেছে সেসবের সাথে সুচের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সূচিশিল্প বলতে যেসব জিনিসের কথা মনে হয় যেমন–নকশি কাঁথা, আসবাবপত্রের আচ্ছাদন, পরিধেয় বস্ত্র এই ধরনের কোন নিদর্শন না পাওয়া গেলেও বস্ত্রের যে ধারণা পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূচিকলার বিশেষ ব্যবহার বা প্রচলন ছিল।

---

[৫] ড. প্রদ্যেত ঘোষ, *বাংলার লোক শিল্প*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ:১২৩

[৬] মহেঞ্জোদাড়ো, https://bn.wikipedia.org/s/1zzr

[৭] পাণ্ডু রাজার ঢিবি,
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%A2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF

(৪) বৈদিক যুগ (১,৫০০-৫০০ খ্রি.পূ.)

সনাতন ধর্মের সর্ব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ। আনুমানিক ১৫০০ খ্রি. পূ. সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের পরে বেদকে ভিত্তি করে এই যুগের সূচনা হয়। বেদে সূচিশিল্পের উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদের স্তোত্রে অভঙ্গুর সুচ দিয়ে সূচিকলার কথা বলা হয়েছে। এই শাস্ত্রে সোজা এবং বাঁকানো উচ্চমান সম্পন্ন সুচের ব্যবহার সম্পর্কে বলা আছে। যেগুলো বর্তমানের সুচের মতই ডিম্বাকৃতির চোখ সদৃশ ছিল।[৮] এখানে বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের সুচের ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, বর্তমানের সুচের সাথে মিল রয়েছে, অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে, সূচিকলার যে প্রধান সরঞ্জাম তার গঠনে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি।

(৫) লৌহ যুগ (১০০০ খ্রি. পূ. আনুঃ)

আনুমানিক খ্রি.পূ. ১০০০ অব্দে ভারতে লৌহযুগের সূচনার মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান হয় এবং ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। এই যুগে সমগ্র ভারতে লোহার বহুল বিকাশ হয়েছিল। পূর্ব ভারতে অর্থাৎ (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশা রাজ্য) এ সময়ের একটি লৌহকর্ম কেন্দ্র পাওয়া গেছে।[৯] অর্থাৎ, এ যুগে বাংলায় লৌহের ব্যবহার ছিল এবং পূর্ববর্তী সভ্যতায় ব্রোঞ্জের সুচ পাওয়া যায়। সুতরাং, এ যুগে সূচিবস্ত্রের তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সুচের ব্যবহার যে ছিল তা নিশ্চিত। বর্তমানে যে সুচ তৈরি হয় তা বিভিন্ন ধাতব উপাদান যেমনঃ কার্বন, ইস্পাত, নিকেল, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতু দ্বারা। অর্থাৎ সুচ তৈরির উপাদানে দেখা যাচ্ছে ধাতব বস্তুর ব্যবহার সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল।

(৬) মহাজনপদ পর্ব (৭০০-৩০০ খ্রি. পূ.)

মহাবস্তুতে (আদি বৌদ্ধধর্মের লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের একটি ধর্মগ্রন্থ) ভারতীয় উপমহাদেশের ১৬টি জনপদের উল্লেখ আছে। যার মধ্যে একটি জনপদের নাম 'অঙ্গ'। এটি ৬০০ খ্রি.পূ. এর দিকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিকাশ লাভ করে এবং একই সময়ে এটি মগধ দ্বারা অধিকৃত হয়।[১০] (চিত্রঃ ০৬)। মগধ রাজ্য মহাজনপদের একটি শক্তিশালী রাজ্য। যা বর্তমানে বিহারের পাটনা, গয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের কিছু অংশ এবং বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। খ্রি.পূর্ব ৬০০-৫০০ সময়ে বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে কাঁথা ও বয়ন শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] জানা যায়, খ্রি.পূর্ব ৭০০-৬০০ অব্দে এ অঞ্চলে পোশাকে যারা সূচিকাজ করতো, তাদের এই কাজকে আলাদা পেশা হিসেবে গণ্য করা হতো এবং এদেরকে বলা হতো সূচিকর। বর্তমান সমাজেও এমন মানুষ রয়েছে, যাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান

[৮] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃঃ ৪।

[৯] লৌহ যুগ, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8C%E0%A6%B9_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97

[১০] মহাজনপদ, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A6

[১১] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃঃ ৪।

উৎস সূচিনকশা। এখন এই সূচিকাজের সাথে বিভিন্ন ধাপে ধাপে কিছু কাজের ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে যেমন: নকশাবিদ- যে নকশা অঙ্কন করে এবং পরবর্তীতে যে সুচ–সুতার সাহায্যে নকশা ফুঁটিয়ে তোলে। অর্থাৎ সূচিকাজকে যারা টিকিয়ে রেখেছে, এ যুগের সূচিকারদেরকে তাদের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

(৭) মৌর্য সাম্রাজ্য (৩২১-১৮৪ খ্রি.পূ.)

এ যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ শিল্প–বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। দেশে–বিদেশে তৎকালে ভারতীয় বস্ত্রের সুনাম ছিল। কাশী, কোংকন, বঙ্গ ও মহীশূর বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ সময় কারুকার্যময় কার্পাস, রেশম ও পশম বস্ত্র প্রচলিত ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, ব্রোঞ্জ, টিন প্রভৃতি ধাতুর বহুল ব্যবহার ছিল।[১২] যেহেতু সুচ একটি ধাতব পদার্থ অর্থাৎ এসব ধাতুর ব্যবহার থাকলে সেখানে সুচও তৈরি হতো তা বলাই বাহুল্য। মৌর্য যুগে যেসব বস্ত্রে কারুকাজ করা হতো, তা বিভিন্ন ধরনের সুচের দ্বারা খুবই সূক্ষ্মভাবে নকশা তোলা ছিল বলে ধারণা করা যায়।

মৌর্য যুগের চানক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (৩৪০-২৯৮ খ্রি. পূ.) বস্ত্রশিল্পের বিশেষ খ্যাতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, এ যুগ থেকে বাংলায় বস্ত্রশিল্পের একটি বিপ্লব সাধিত হয়। যেখানে সুচ পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। কারণ, মসলিনের তৈরি পদ্ধতিতে সুচ সরাসরিভাবে ব্যবহৃত হয় না। এখানে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের সূক্ষ্ম বস্ত্রের কথাও উল্লেখ আছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বলতে এখানে চিকন সুতার তৈরি নরম মসলিনকেই নির্দেশ করা হয় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ বাংলার মসলিনের চাহিদা ও প্রচলন ছিল বিশ্বব্যাপী।

উল্লেখিত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, বস্ত্রশিল্পে কারুকার্যময় কাপার্স বস্ত্রের যখন প্রচলন ছিল, তখন এখানে 'কারুকার্যময়' বলতে সূচিকর্মের কথাই বোঝানো হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। এরপর বাংলা আরও কিছু রাজ্যের অধীনে ছিল। তবে, মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস ছিল অন্ধকারচ্ছন্ন। যদিও পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমির বিবরণ থেকে খ্রিষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, সেখানে গঙ্গারিডাই রাজ্যের 'গঙ্গে' ছিল রাজধানী ও সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। সেখান থেকে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় বিদেশে রপ্তানী হত।[১৩]

[১২] অতুল চন্দ্র রায়, সুরঞ্জনা সান্যাল, *ভারতের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরী, কোলকাতা, ২০১৩, পৃ: ১২১।

[১৩] ড. মোঃ শাহজাহান, *বাংলার ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১২০৪ খ্রি.) তূর্য প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ: ৫৩।

(৮) গুপ্ত যুগ (৩২০-৫৫০ খ্রি.)

ধারণা করা হয় গুপ্ত আমল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মূলত সুচ ও সুতার বহুল ব্যবহার শুরু হয়। এ সময়ে সেলাই করা কাপড় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৪] সুন্দর সেলাই করা পোশাকে নকশা ছিল রাজকীয় প্রতীক। এখান থেকেও সেটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ যুগের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সূচিশিল্প বেশ সমৃদ্ধ ছিল। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিশেষ করে যে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা পাওয়া গেছে সেখানে পরিধেয় পোশাকে যে নকশা লক্ষ্য করা যায়, তা সূচিনকশার হতে পারে।

(৯) পাল যুগ (৭৫০-১১৭৪ খ্রি.)

আরব ও চীনা পর্যটকেরা এ সময়ে বাংলার মিহি সুতার কাপড়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তখন মিহি সুতার সাথে মোটা কাপড়ও প্রচুর তৈরি হত। ৮০০-১২০০ খ্রি. রচিত চর্যাপদে (বাংলা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন) তাঁতশিল্পের কথা জানা যায়।[১৫] তাঁত ও সুচ–সুতার কাজ ভিন্ন হলেও অনেক সময় তাঁতে তৈরি কাপড়ের জমিনে সুচ–সুতার কাজ করা হতো। সুতরাং, চর্যাপদের তথ্য মতে এদেশে তাঁত শিল্প ছিল অর্থাৎ সেখানে সূচিশিল্পের বা তার উপর সূচিনকশা করা হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া ৭০০-১১০০ খ্রিষ্টাব্দের সময়ে নালন্দা বিহার, ভারতে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র ম্যানুস্ক্রিপ্টের চিত্রে দেবীর পরিহিত পোশাকে যে বিশেষ নকশা দেখা যায়, তা সূচিনকশার সাথে সাদৃশ্যময়।[১৬] (চিত্র: ০৭)

(১০) বাংলায় ইসলামিক অনুশাসন (১২০৪-১৬০০ খ্রি.)

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন। যা ছিল সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি নতুন বাঁক। ১৪০০ সালের দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ বাণিজ্য পথের অধিকারী হয় বাংলা সালতানাত বা শাহী বাংলা (ওড়িশা, আরাকান, ত্রিপুরা এবং ১৪৯৪ থেকে কামরুপ এবং কামতা) বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং সিলেট এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৭] মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৪০০ সালে বাংলার বাণিজ্যিক রাজধানী সাঁতগাও এর (বর্তমান অবস্থান হুগলী জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) ঐতিহাসিক প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। জন আরউইন এবং মার্গারেট হল 'সাতগাঁও'কে লেপ কাঁথা (আকারে বড় ও মোটা) তৈরির স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণব সন্তকবি বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবত (চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ) (১৫০৭-১৫৮৯ খ্রি.)

---

[১৪] ধারালো সুইয়ের বিস্তৃত ইতিহাস,
https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8?amp

[১৫] ড. মোঃ শাহজাহান, *বাংলার ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ থেকে ১২০৪ খ্রি.) তূর্য প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ: ৫৩।

[১৬] https://en.wikipedia.org/wiki/Prajnaparamita

[১৭] মুসলমানদের ভারত বিজয়,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%AF%E0%A6%BC

কাব্যে এবং বিপ্রদাশ পিপিলাই (পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা কবি) তাঁর 'মনষা বিজয়' কাব্যে (১৪৯৫-১৪৯৬ খ্রি.) এই বন্দরের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] কাঁথা এমন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান যা অল্প শীতের মৌসুমে অধিক উপযোগী। যে কারণে এখন অব্দি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কাঁথার প্রচলন রয়েছে, তবে যে স্থানে বেশি উৎপাদন হয়, সেই স্থানটি অধিক পরিচিত হয়। তেমনিভাবে এ যুগে 'সাতগাঁও'–এর আলাদা পরিচিতি ছিল। এ সময় সাতগাঁও-এ সূচিনকশাযুক্ত তসর বা মুগা সিল্ক বিছানার চাদর ইউরোপীয়দের খাটের উপযুক্ত করে তৈরি করা হতো। এই সব চাদরে রানিং স্টিচ, ব্যাক স্টিচ ও চেইন স্টিচ এর ব্যবহার থাকত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে হলুদ সিল্কের উপর জীব–জন্তু শিকারের চিত্র সম্বিলিত কাঁথার সন্ধান পাওয়া গেছে বর্তমান ভারতের হুগলী জেলায়। এইসব লেপ বা নকশি কাঁথায় বাংলার টেরাকোটার কাজ এবং বিচিত্র নকশার রীতির সাথে সূচি নকশার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। [১৯] (চিত্র: ০৮)।

(১১) মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.)

মূলত ১৫৫৬ সালে সম্রাট আকবরের ক্ষমতা আরহণের মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যের ধ্রুপদী যুগের শুরু হয়। এ সময় বাংলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল। কৃষি, জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।[২০] তৎকালে বাংলার সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র ছিল ঢাকা। ১৬০০ সালের মধ্যভাগে পর্তুগীজ ও ইংরেজ বণিকরা এদেশে দৃঢ়ভাবে বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করে। ১৫৭০-১৬৫০ সালের মধ্যে সূচিনকশায় পর্তুগীজ সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। যেমন–একটি চাদর কয়েকটি অংশে ভাগ করে তাতে জ্যামিতিক চিত্র, গ্রোকো– রোমানের পৌরাণিক দেবতা ও বীরদের প্রতিকৃতি, ওল্ড টেস্ট মেন্টের রাজা ও গৌষ্ঠিপতির সঙ্গে আলিঙ্গন, জাহাজে পর্তুগীজ নাবিক ও তার চারপাশে মৎসকুমারী, জল দানবসহ মকরমূর্তি ইত্যাদি দেখা যায়।[২১] এই কাঁথাগুলোকে ইন্দো-পর্তুগীজ কাঁথা বলা হয়। (চিত্র: ০৯)।

কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গে সংরক্ষিত এমন একটি কাঁথায় মৎসকুমারির মোটিফ দেখতে পাওয়া যায়। যা ভারতের হুগলি জেলায় ১৬০০-১৬২৫ খ্রি. সময়ে তৈরি। (চিত্র:১০)।[২২] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, সূচিকলার উৎপন্ন নকশাগুলো মানুষের আশেপাশে বিচরণ করছে অর্থাৎ তাদের চলমান জীবন ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন সব বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হতো। পতুর্গীজ বা স্পেন, রোমানদের সংস্কৃতিতে বাংলার সূচিনকশা দেখা গেছে। বিভিন্ন ধরনের বর্ণনামূলক নকশাই সাধারণত কাঁথা বা

[১৮] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কালকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃ: ৪।
[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।
[২০] মুঘল সাম্রাজ্য, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A6%B2
[২১] ড. প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোক শিল্প*, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, পৃ: ১১৫।
[২২] Patrick J Finn, *Quilts of India- Timeless Textiles,* Niyogi Books, New Delhi- 110 020, India, page: 20.

চাদরে বেশি দেখা যায়। ধারণা করা হয় কাঁথার বিস্তৃত পটই সূচিনকশায় বর্ণনামূলক নকশার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা রেখেছে। যেহেতু এ যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু দেশের ও পেশার মানুষের আগমন ঘটে, সেহেতু তাদের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতির প্রভাব সূচিনকশায় শোভা পেতে শুরু করে। অর্থাৎ, যখন যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন ছিল তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বা তার পারিপার্শ্বিকতায় সূচিকাজের নকশাগুলো পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হতে থাকে।

গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে (উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বাংলার পূর্ব–সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত) রৈখিক নকশা এবং সূক্ষ বুটিযুক্ত বস্ত্র দেখা যেতো, সেগুলো সাধারণত সুচিকাজের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হতো।[২৩]

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে জোলা শ্রেণিরা তাঁত বস্ত্র বুনন করতো এবং একই সাথে তাঁরা সূচিকাজও করতো। এরা প্রধানত মসলিনের ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিল এবং সাদা কাজ (চিকন), রেশম, সোনার সুতা দিয়ে মুসলমান পুরুষরা সূচিকাজ করতো, যার নাম ছিল 'জারদোজী (Zardozi)'। এই কাজের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জনের স্ত্রী মেরি ভিক্টোরিয়া কার্জনের জন্য জিন-ফিলিপ ওর্থের ডিজাইনে দিল্লী ও আগ্রার সূচিকর্মীদের দ্বারা সোনা ও রূপার সুতা দিয়ে একটি জারদোজী গাউন তৈরি করা হয়। লেডি কার্জন পাশ্চাত্য ফ্যাশনে ভারতীয় সূচিকাজকে জনপ্রিয় করে তোলেন।[২৪] (চিত্র:১১)। এই ধরনের সূচিনকশার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের সূচিশিল্পে ভিন্ন ধারার সূচনা হলো, রঙিন সুতার সাথে সাথে উপাদান হিসেবে প্রাধান্য পেলো চকচকে ধাতব বস্তু। যেগুলোর ব্যবহারে নকশায় ত্রিমাত্রিক জমিন দেখা যায় এবং পোশাক অনেক বেশি জৌলুসপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানেও বাংলাদেশে জারদোজী নামক সূচিকর্মের পোশাক পাওয়া যায়। সাধারণত এসব শাড়িতে চুমকি, পুঁতি ও কুন্দনের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই ধরনের কাজ বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

অন্যদিকে, দরিদ্র মুসলিম নারীরা মুগা, এন্ডি এবং সুতির উপর 'কশিদা' নামে সূচিশিল্প তৈরি করতো। এছাড়া মালদা জেলায় মুসলিম নারীরা 'রেজাই (Rezai)' নামে রেশমের কাঁথা তৈরি করতো। হিন্দু ধোপানীরা সূচি কাজ করতো।[২৫] (চিত্র:১২)।

'কশিদা'–মুঘল যুগের সূচিকলার অন্যতম প্রধান নিদর্শন। তবে, কাশ্মীরে প্রধানত এর প্রচলন শুরু। এই সূচিকর্মে শোভা পেতো–ফুল, পাখি, লতা–পাতা, গাছ ইত্যাদি প্রাকৃতিক মোটিফ। ফোঁড় ব্যবহৃত হতো –Single stich, satin stich, Herringbone, chain, knot ইত্যাদি।[২৬] (চিত্র: ১৩)।

---

[২৩] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃ: ১১৬।

[২৪] লেডি কার্জনের পিকক ড্রেস, https://en.wikipedia.org/wiki/Peacock_dress_of_Lady_Curzon

[২৫] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৬, পৃ: ২১।

[২৬] ড. আবু তাহের, *বাংলাদেশের নকশি কাঁথা*, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃ: ১৬।

১৯ শতকে ঢাকায় তৈরি একটি মুগা কশিদার নিদর্শন পাওয়া গেছে। (৫৫x৫৪) ইঞ্চি মাপের কশিদাটির দুই পাড় একসাথে সেলাই করে চওড়া করা হয়েছে। এটিতে একরঙা ফুলেল ও বোতেহ্ মোটিফ রয়েছে। জানা যায় এ ধরনের কাজ সাধারণত বাসরা এবং জেদ্দায় রপ্তানীর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হতো। হজ্জ যাত্রীরা ও আরবরা পাগড়ী ও পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতো। বলা হয়ে থাকে এটি এসেছে আচেহ, সুমাত্রা থেকে।[২৭] (চিত্র:১৪)। দেখা যাচ্ছে যে, এটি সোনালি রঙের মুগা সিল্কের উপরে সোনালি রঙের সুতা দিয়ে কাপড়ের সম্পূর্ণ জমিনে ভরাট নকশা করা এবং হজ্জ যাত্রীরা ব্যবহার করতো বা বিশেষ পোশাক হিসেবে পরিধান করতো এবং ইরাক, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এর ব্যবহার ছিল। শুধু তাই নয় এখানে মোটিফ শোভা পাচ্ছে তার উৎসও পারস্য বা ইরান। অর্থাৎ, কশিদাকে বিশেষ পোশাক বা আলঙ্কারিক পোশাক হিসেবে সেই সময় কদর করা হতো এবং মুসলিম দেশগুলোতে এর বিশেষ চাহিদা ছিল।

এ পর্বে ইসলামিক ভাবধারার নকশা সূচিকলায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, প্রাকৃতিক উপাদান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এসব নকশার সৃষ্টি হয়েছে এবং যে ফোঁড়গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে, তাও সেসব উপাদানের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নকশা অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া এই যুগে ঢাকায় মুসলমানদের শবাচ্ছাদক বস্ত্র, বিবাহের পোশাক–পরিচ্ছদে সোনালি–রূপালি পাত ও কশিদায় সূচিনকশার সাথে এই পোশাকের ধারগুলোতে ছাপার কাজ থাকত।[২৮]

এ সময় রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে এদেশের বস্ত্রশিল্পের অত্যধিক চাহিদা ছিল। মুঘল সম্রাটগণ সূচিশিল্পের কাজকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।[২৯] ১৭ শতকের প্রথম দিকে সূচিকাজের মাধ্যমে তৈরি একটি শিকারের কোট সম্পর্কে জানা যায়-যেখানে সাদা স্যাটিন কাপড়ের উপর ফুল, গাছ, ময়ূর, সিংহ এবং হরিণের চিত্র চেইন ফোঁড়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও জানা যায় যে, এই ধরনের কাজ তৎকালিন গুজরাটি মুচি সম্প্রদায় মুঘল রাজসভাসদদের জন্য তৈরি করতো ও পশ্চিমা বিশ্বেও তা রপ্তানি করতো।[৩০](চিত্র: ১৫)। সাধারণত মুঘল যুগে রাজা–বাদশাহ্দের বিলাসবহুল জীবন–যাপনে বিভিন্ন ধরনের জৌলুশময় জিনিস শোভা পেতো, বিশেষ করে চাকচিক্যময় পোশাক ছিল চোখে পড়ার মতো এবং এসব পোশাকের আলংকারিক নকশাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূচিকলার মাধ্যমে তৈরি করা হতো। সে কারণে বলা হচ্ছে যে, তারা এই কাজকে অন্য রকম মর্যাদা এনে দিয়েছেন। কারণ, সম্রাটদের বা তাদের রাণীদের দৈনন্দিন ব্যবহারে যখন এসব সূচিশিল্পমন্ডিত সামগ্রী যুক্ত হতে শুরু করল খুব স্বাভাবিকভাবেই তার কদর ও চাহিদা বাড়তে শুরু হল। যেমন: ১৯

[২৭] https://wovensouls.com/products/1516-rare-antique-dhaka-kashida-silk-embroidery

[২৮] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃ: ২১।

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪।

[৩০] https://collections.vam.ac.uk/item/O16066/hunting-coat/

শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি ভারতের তৎকালিন 'ঔধ' রাজ্যের রাণীর একটি পোশাক সম্পর্কে জানা যায়-যে পোশাকটি মসলিন কাপড়ের উপর সিল্ক সুতা ও সোনা-রূপার সূচিকাজ দিয়ে তৈরি করা হয়।[৩১] (চিত্র:১৬)। এসময় অধিক উৎপাদন শুরু হলো এবং এ শিল্পের সাথে আরও কিছু মানুষ সংযুক্ত হয়ে গেলো। এভাবে সূচিশিল্পের ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক বাজার সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো, নারী–পুরুষ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ সূচিকর্মকে উপজীব্য করে জীবন–ধারণ শুরু করলো এবং সৌখিনতা থেকে বেরিয়ে তা বৃহৎ পরিসরে কাজের সূচনা হলো।

(১২) ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্য (১৮৫৮-১৯৪৭ খ্রি.)

১৮৫৮ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় চলে আসে।[৩২] ফলে ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাক–ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশরা নানান ধরনের ব্যবসা–বাণিজ্য শুরু করে যার মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যবসা ছিল বস্ত্রশিল্পকে ঘিরে।

এ সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সূচিনকশা সম্বলিত লেপ-কাঁথা চড়া দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত।[৩৩] অর্থাৎ, এ সময়ে বাংলার লেপ-কাঁথার নকশা ও মূল্যে বিশাল পরিবর্তন আসলো। যেহেতু ইংল্যান্ডে তা অধিক দামে বিক্রি হচ্ছে, সুতরাং সে দেশের উপযুক্ত চাহিদা অনুযায়ীই তা তৈরি করা হতো।

সুচ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯ শতক ছিল শ্রেষ্ঠ সময়। নিত্য-নতুন মেশিনারি, সেলাই মেশিনের আবিষ্কার, টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশ, স্টিম জাহাজের কারণে সারা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এসময় সূচিশিল্পেরও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে ব্যাপক হারে ১৯০৬ সালের দিকে আমেরিকাতে আনুমানিক তিরিশ লক্ষাধিক সুচ উৎপাদন হতো এবং বিক্রিও হতো। যার বেশিরভাগ সুচ তৈরি হতো ইংল্যান্ডে।[৩৪] সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে সূচিশিল্প প্রসারে ইংল্যান্ডের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায় এবং এখান থেকে সূচিকর্ম ইংল্যান্ডে যাওয়ায়, বাংলার সূচিশিল্পের ইতিহাসে যে ইংল্যান্ড বিশেষ স্থান নিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এছাড়া ১৯২৯ সালে প্রকাশ পাওয়া পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন- এর বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য আখ্যানকাব্য 'নক্সী কাঁথার মাঠ'- এ বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার

---

[৩১] https://in.pinterest.com/pin/121667627403232605/

[৩২] ব্রিটিশ ভারত,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4

[৩৩] শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৭০০০০৯, ২০১৬, পৃ: ৪।

[৩৪] ধারালো সুইয়ের বিস্তৃত ইতিহাস,
https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8?amp

একজন ব্যক্তির জীবনকে উপজীব্য করে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। সেখানে নাটকীয়ভাবে নকশী কাঁথার প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে এবং বর্ণিত নকশি কাঁথার নকশা ও একটি নকশি কাঁথা তৈরির সাথে জড়িত বাঙালির যে আবেগ তা চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সময়কালের গৃহবধূরা তাঁদের সকল আবেগ–আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও স্বপ্ন মিলিয়ে মনের মাধুরী দিয়ে নকশা করতো কাঁথাতে। যেখানে শোভা পেতো–নকশিফুল, বিয়ের বাসর, বাসগৃহ, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রভৃতি। গল্পের এক পর্যায়ে নকশি কাঁথার বর্ণনায় কবি লিখেছেন-

"নক্সী-কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যাথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।
এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন,
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ-চিন।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে, সিলাই করেছে সে যে;
গুন্‌গুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।"[৩৫]

অর্থাৎ, সাজু মনের আনন্দে তাঁর জীবনের গল্প দিয়ে নকশি কাঁথাটির সেলাই শুরু করেছিল। কিন্তু যখন দুঃখ-কষ্টে বিপর্যস্ত হয় তখন আবার সেই কাঁথাতেই তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে–

"খুব ধরে আঁকিল যে সাজু রূপার বিদায় ছবি,
খানিক যাইয়া ফিরে ফিরে আসা, আঁকিল সে তার সবি।
আঁকিল কাঁথায় – আলু থালু বেশে চাহিয়া কৃষাণ নারী,
দেখিছে – তাহার স্বামী তারে যায় জনমের মতো ছাড়ি।
আঁকিতে আঁকিতে চোখে জল আসে, চাহনি যে যায় ধুয়ে,
বুকে কর হানি, কাঁথার উপরে পড়িল যে সাজু শুয়ে।"[৩৬]

জীবনের শেষ সময়েও সাজু তার মনের একান্ত চাওয়াকে তুলে ধরেছে নকশি কাঁথায়–

"একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সূঁচ সুতা দাও হাতে,
শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।"[৩৭]

প্রিয় মানুষটি ফিরে এসে যেন এই নকশি কাঁথাটি দেখে তাঁর ব্যাথাকে অনুভব করতে পারে সে কামনাও দেখা যায়–

---

[৩৫] জসীম উদ্‌দীন, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, পলাশ প্রকাশনী, ১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা-১২১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯২৯, বিংশ প্রকাশ ১৮ মার্চ ২০১৩, পৃঃ ৭২।
[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।
[৩৭] প্রাগুক্ত।

"তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী কাঁথার পরে।
মোর যত ব্যাথা, মোর যত কাঁদা এরি বুকে লিখে যাই,
আমি গেলে মোর কবরের গায় এরে মেলে দিও তাই!
মোর ব্যাথা সাথে তার ব্যাথাখানি দেখে যেন মিল করে,
জনমের মত সব কাঁদা আমি লিখে গেনু কাঁথা ভরে।"[৩৮]

সুতরাং, এই কাব্যের বিশ্লেষণে বলা যায় যে, সাজু এখানে তৎকালিন গ্রামীন নারীর প্রতিনিধিত্ব করছে, যেখানে লোক সমাজে নকশি কাঁথা যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে, মানুষের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও যে এই শিল্পের এক অনন্য যোগসূত্র পাওয়া যায়, তা সত্যিই ব্যতিক্রম।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য ভারতীয় অধিরাজ্য (বর্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্র) ও পাকিস্তান অধিরাজ্য নামে দু'টি দেশে বিভক্ত হয়ে (যেখানে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধিনে পূর্ব পাকিস্তান নামে ছিল) এই যুগের অবসান ঘটায়।

(১৩) পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে চিহ্নিত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) এর অধিনস্ত থাকে। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত হওয়ায় আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে ভাটা পড়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে, এই দুই অঞ্চলের ধর্মবোধ একই ছিল এবং মানুষের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছিল। যার ফলে সংস্কৃতির আদান প্রদান অব্যাহত ছিল। সূচিশিল্পের কর্মকান্ড এসময় অধিকাংশই সৌখিনতা ও ঘরোয়া পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জানা যায় এ সময়ে ইসলামিক বাণী বা কুরআনের আয়াত সম্বলিত সূচিকাজের দেওয়াল সজ্জার প্রচলন হয় যা সৌখিন সামগ্রী হিসেবে মুসলিম ঘরে ঘরে শোভা পেতো এবং এগুলো তৈরি হতো সেই সব ঘরেরই বউ–ঝিদের হাতে। সূচিনকশার মধ্যে ভরাট ফোঁড়ের ফুল–পাতা সম্বলিত নকশা এবং কাটওয়ার্কের নকশার বিশেষ প্রচলন ছিল।

এ সম্পর্কে সূচিশিল্পী বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ এর কাছ থেকে জানা যায় যে, তাঁদের পৈত্রিক নিবাস ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পিরোজপুর জেলায়। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ৫ বছর। তিনি জানান, তাঁর মা নিজ হাতে কিছু সূচিনকশার কাজ করেছিলেন যেগুলোর বেশিরভাগই ছিল দেওয়ালসজ্জা, যা তাদের বসার ঘরের বিশেষ করে দরজা ও জানালার উপরিভাগের দেওয়ালের অংশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল। এগুলো কাঁচ ও কাঠের ফ্রেম দ্বারা বাঁধাই করা ছিল।

---

[৩৮] জসীম উদ্‌দীন, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, পলাশ প্রকাশনী, ১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা-১২১৭, প্রথম প্রকাশ ১৯২৯, বিংশ প্রকাশ ১৮ মার্চ ২০১৩, পৃ: ৭৫।

এই দেওয়ালসজ্জাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন শ্লোক যেমন:

'যাও পাখি বল তারে, সে যেন ভোলে না মোরে';

'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিপ্লবী' কবিতার প্রথম দুটি স্তবক-

"বল বীর, বল উন্নত মম শীর"।

এছাড়া তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের বাংলা জন্ম তারিখ ও সন লেখা একটি দেওয়ালসজ্জা ছিল। কুরআন-এর আয়াত (আয়াতুল কুর্‌সি) লেখা একটি দেওয়ালসজ্জাও সে সময় দেওয়ালে সজ্জিত ছিল। এগুলোর অধিকাংশই সাদা সুতি কাপড়ে কালো রঙের সুতা দিয়ে অক্ষরগুলো ফুটিয়ে তোলা হতো এবং বিশেষ বাণীগুলোর সাথে মানানসই ফুল, লতা–পাতার নকশা শোভা পেতো যার অধিকাংশই ভরাট ফোঁড়ের মাধ্যমে সেলাই করা ছিল। সুতা হিসেবে DMC (বর্তমানেও পাওয়া যায়) সুতা ব্যবহৃত হয়। কিছু একরঙা বা বিচিত্র বর্ণেরও দেখা যেত। ১৯৬৬ সালে তৈরি কুষ্টিয়ার জাহানারা খাতুনের একটি সূচিনকশার দেওয়াল সজ্জা রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের চিত্রা হরিণকে সাদা জমিনে ভরাট সেলাই এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (চিত্র: ১৭)।

খ) বাংলাদেশ পর্ব

মানুষ তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বা অবসরের খোরাক যোগাতে সেভাবে একই সমান্তরালে সূচিকাজ করছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভূখন্ডের জন্ম হলে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, আহত দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে সংঘটিত করা ও যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবন–যাপনে অভ্যস্ত করতে অনেকটা সময় লাগলেও এক সময় বাংলাদেশ স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়। গ্রাম–বাংলার মানুষজন নিজেদের কাজে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে সকলেই নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য রচনায়ও মনোনিবেশ করে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে সূচিশিল্প অন্যতম। সূচিশিল্পের মধ্যে কাঁথা বা নকশিকাঁথা গ্রামে বেশি হলেও শহরে যে এর প্রচলন ছিল না তা নয়। তবে, শহরে কাঁথা বা নকশিকাঁথার থেকে সৌখিন সামগ্রী যেমন– দেওয়াল সজ্জা, কার্পেট, পাপোশ, আসন (চটের তৈরি) ইত্যাদি বেশি দেখা যেত। পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সূচিশিল্পকে দেশের একটি অর্থকরী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সূচিশিল্পের উপরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির পদক্ষপ গ্রহন করেন। যেখানে বাণিজ্যিকভাবে সূচিশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটলো এবং এখন পর্যন্ত তা চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সূচিশিল্পের উন্নয়নে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিসিক, আড়ং, ব্রাক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,

পুনাক, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জয়িতা ইত্যাদি। নিম্নে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সূচিশিল্পের সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হলঃ

০১. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

যদিও এটি ১৯৫৭ সালের সংসদীয় আইনের অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত। তৎকালীন নাম 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প'। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর নাম হয় 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন'- সংক্ষেপে 'বিসিক'। এটি দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের লক্ষে কাজ করে। বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান ভূমিকা রাখছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে এর ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। প্রতিটি জেলায় ১টি করে শিল্প সহায়ক কেন্দ্রও রয়েছে। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, এছাড়া বিভিন্ন কারিগরী তথ্য, বাজারজাতকরণ, ঋণ দান, দক্ষতা উন্নয়ন, হ্যান্ডিক্রাফট এর নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছে।[৩৯] যেখানে সরাসরি সূচিনকশার সাথে সম্পৃক্ত কাজ না থাকলেও এ শিল্প নিয়ে যারা কাজ করছে তারা বিসিকে বিভিন্ন কর্মসূচি দ্বারা সরাসরি সুবিধা ভোগ করছে। তাই, বিসিক বাংলাদেশ পর্বে সূচিশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বিসিকের সংগ্রাহশালায় আনুমানিক ১৯ শতকে তৈরি শতদল পদ্ম মোটিফের একটি সুজনি কাঁথা এবং জীবনবৃক্ষ মোটিফের একটি নকশিকাঁথা সংগৃহীত ছিল বলে জানা যায়।[৪০] (চিত্রঃ ১৮)।

০২. আড়ং (ব্র্যাক)

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা ব্র্যাক। ১৯৭২ সালে দেশের কৃষি, খাদ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করে। ব্র্যাকের হস্তশিল্প প্রকল্পের আওতায় যেসকল কাজ হচ্ছে তার মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে সূচিশিল্প। বাংলাদেশে সূচিশিল্পের জন্য যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে আড়ং। আড়ং-ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত একটি হস্ত ও কারুশিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, বগুড়া, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহে মোট ২০টি শাখা রয়েছে। ১৯৭৬ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর স্ত্রী আয়েশা আবেদ ৫ জন দুস্থ নারী নিয়ে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। কিন্তু নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় লোকসান হতে থাকে। তাই এখান থেকে ১৯৭৮ সালে ঢাকার শ্যামলীতে প্রথম একটি বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ফলে এই কাঁথা সেলাই-এর কাজে আরও অনেক কর্মী যুক্ত হতে থাকে। ১৯৮১ সালে

[৩৯] বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, উইকিপিডিয়া।

[৪০] ড. আবু তাহের, *বাংলাদেশের নকশিকাঁথা*, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারী ২০০৪, পৃঃ ৩৩,৩৫।

এক দূর্ঘটনায় আয়েশা আবেদের মৃত্যুর পর ১৯৮৩ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ মানিকগঞ্জে 'আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন' গড়ে তোলেন। এটি মূলত আড়ং-এর পণ্য তৈরির কারখানা। বর্তমানে সমগ্র দেশে ১৫টি ফাউন্ডেশন রয়েছে। যেখানে প্রায় ৩০ হাজার কর্মী কাজ করছে, রয়েছে ৩৫ হাজার প্রডিউসার। নকশিকাঁথার কাজ হচ্ছে জামালপুর, শেরপুর, কুষ্টিয়া ও যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে। এই কর্মীদের ৯০% নারী এবং প্রত্যেকেই ব্র্যাক সমিতির সদস্য। একজন দক্ষ কর্মীর তত্ত্বাবধায়নে রেখে অন্যান্য কর্মীদের চাকরি থাকাকালীন অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একটি ডিজাইন থেকে সর্বোচ্চ ৩০-৩৫টি পণ্য তৈরি করা হয়।[৪১] চাহিদা অনুযায়ী অনেক সময় বৃদ্ধিও পায়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সূচিপণ্য মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। (চিত্র: ১৯)।

০৩. কারুপল্লী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের একটি প্রতিষ্ঠান। এটি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে জাপান ওভারসিস কর্পোরেশন ভলান্টিয়ার (JOCV) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) -এর সমবায় সমিতির সদস্যদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দেয়া এর লক্ষ্য।[৪২] এর মাধ্যমে দেশিয় হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ ও তার উৎপাদিত পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এখানের হস্তশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- নকশি কাঁথা, শাড়ি, বাচ্চাদের ফ্রক, টু-পিস, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পোশাক, সৌখিন সামগ্রী, গহনা ইত্যাদি। তবে এখানকার শিল্পের মধ্যে সুচ–সুতার কাজই প্রধান। এই প্রকল্পে প্রধানত গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা কাজ করে থাকে ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে পারছে এবং আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

০৪. জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নারী পুনর্বাসন বোর্ড। ১৯৭৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় মহিলা সংস্থা'।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য। আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে

[৪১] ৬৫হাজার কর্মীর 'আড়ং', https://www.banglatribune.com/amp/lifestyle/378999/%E0%A7%AC%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%82

[৪২] কারুপল্লী, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://yellow.place/en/karupalli-%E0%A5%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A5%A4-dhaka-bangladesh

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল বিত্তহীন মহিলাদের সেলাই ও এমব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেয়া।[৪৩] অঞ্চলভিত্তিক এ রকম প্রকল্পে এলাকার নারীরা স্বতঃফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করছে। বিভিন্ন সেলাই–এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করে তুলছে।

০৫. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

দেশের অসংগঠিত, কর্মপ্রত্যাশী যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন ১৯৮১ সালে 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয়। বেকার যুবকদের উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে এনে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ বাড়াতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৮-৩৫ বছর বয়সীদেরকে বাংলাদেশে যুব জনগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলায় যুব সমাজকে উৎপাদনমুখী করতে আবাসিক ও আনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।[৪৪] এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে সূচিশিল্প, নকশিকাঁথা, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি অন্যতম। বিনামূল্যে বেকার যুবসমাজ বিশেষ করে ১৮-৩৫ বছর বয়সী মেয়েরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পর ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এখানকার সহায়তায় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সূচিশিল্প যা হস্তশিল্প নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান করার সুযোগ পাচ্ছে।

০৬. জয়িতা ফাউন্ডেশন

২০১১ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে 'জয়িতা' পরীক্ষামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই কার্যক্রমটির ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' নামে এই মন্ত্রণালয়ের একটি সহযোগী ও অলাভজনক এবং স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সমগ্র বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ জয়িতা'র প্লাটফর্মে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে। এটি ব্যবসা অনুকূল ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে। এখানে নারী উদ্যোক্তা সমিতির সদস্যগণ একই ছাদের নিচে আলাদা আলাদা স্টলে জয়িতার ব্র্যান্ডে বাজারজাত করে। নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সফল উদ্যোক্তা গড়ে তুলে তাদের মাধ্যমে বিপণন নেটওয়ার্ক ও সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলা এর প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে যেসব নারী উদ্যোক্তারা কাজ করে তাদের অধিকাংশই সূচিশিল্প নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের ছোট বড় অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো সূচিশিল্প নিয়ে কমবেশি কাজ করছে।[৪৫] (চিত্র:২০)।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ পর্বে সূচিশিল্পের যে চর্চা শুরু হল, তা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। যেখানে, সূচিশিল্প শুধুমাত্র চার দেওয়ালের মধ্যে মহিলাদের কাজ, অবসরের খোরাক বলে বিবেচিত হত; সেই

[৪৩] জাতীয় মহিলা সংস্থা, http://www.jms.gov.bd/

[৪৪] যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://dyd.gov.bd/

[৪৫] জয়িতা ফাউন্ডেশন, https://joyeeta.portal.gov.bd/

সূচিশিল্পকে পুঁজি করেই শুরু হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের উৎস আর শৈল্পিক মনের উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা। শুধুমাত্র লাভজনক ব্যবসা হিসেবেই নয়, দেশের পিছিয়ে পড়া অসহায় নারী–সমাজের উত্থানও ঘটেছে এর মাধ্যমে। সূচিশিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ ধরা যায় ১৯৮০ সালের পর থেকে। বিভিন্ন সূচিশিল্পীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, ১৯৯০ সালের পর থেকে সূচিশিল্পের চাহিদা ও সূচিশিল্প নিয়ে দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সূচিশিল্পের নিরীক্ষাধর্মী বিভিন্ন কাজও শুরু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূচিশিল্পের রূপ- বৈচিত্র

সূচিশিল্পের প্রধান আকর্ষণ এর নকশা। কাপড়ের উপর বিচিত্র রঙের সুতার ফোঁড়ের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তুলে তাকে অসাধারণ রূপ দেওয়া সূচিকর্মের অন্যতম প্রধান দিক। যদিও কাপড় ছাড়াও চটের উপরেও সূচিকাজ দেখা যায় এবং সৃজনশীল মানুষের নিরীক্ষাধর্মী কাজে সূচিশিল্পের ক্যানভাস হিসেবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ করে বড় আকারের গাছের পাতা, প্লাস্টিকের ফাঁকা ঘর বিশিষ্ট ফ্রেমও ব্যবহৃত হচ্ছে। সুচ–সুতার সাথে পাথর বা প্লাস্টিকের নানান আকারের বৈচিত্রময় বিটস্ বা পুঁতি–চুমকি দ্বারাও সূচিনকশার কাজ হচ্ছে।

২.১ নকশার বিষয়বস্তু

সাধারণত মানুষের নিত্য দিনের ব্যবহার্য সামগ্রী বা প্রকৃতিতে যা কিছু মানুষকে আকর্ষণ করে তারই উপর অনুপ্রাণিত হয়ে সূচিনকশায় বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশের সূচি নকশার বিশেষ কিছু মোটিফ লক্ষ্য করা যায়; যেগুলোকে সাধারণত লোক মোটিফ বলে নির্দেশ করা হয়। কেননা এদেশের সূচিশিল্পের প্রধান উৎস লোকজ সম্পদ নকশি কাঁথা। আবহমান বাংলার গৃহ বধূদের সরল মনের প্রতিচ্ছবি এসব ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার নকশাগুলোই বর্তমানে সূচিনকশার মোটিফ বলে পরিচিতি পাচ্ছে। তবে, এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, হাজারো নকশার ভীড়ে যে নকশাগুলোকে প্রকৃতি ও জনজীবনে আলাদাভাবে খুঁজে পাওয়া যায় বা তারা নিজস্ব পরিচয়ে সুপরিচিত শুধুমাত্র সেই সকল অবয়ব বা ফর্মকে মোটিফ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেমন:

- ময়ূর
- লক্ষ্মীর পা (হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর পদচিহ্ন)
- পালকি
- পদ্ম ফুল
- মাছ
- পাখি
- হাতি
- জীবন বৃক্ষ
- নদী–মাতৃক গ্রাম বাংলার দৃশ্য
- নৌকা

- কুলা
- কলকা
- হাড়ি
- কলসি
- খেঁজুর গাছ
- কলাসহ কলাগাছ
- পান পাতা
- চাঁদ
- সূর্য
- মসজিদের মিনার
- আলপনা
- দোলায়িত পুষ্পিত লতা
- আয়না
- চিরুনী
- সামাজিক রীতি–উৎসব চিত্রঃ বিয়ের বরযাত্রী, রথযাত্রা, নতুন বউ, নৃত্যরত নর–নারী ইত্যাদি।

সাধারণত এসব এক বা একাধিক মোটিফকে কেন্দ্র করে সূচিনকশা সৃষ্টি করা হয়।

২.২ মোটিফ বিশ্লেষণ

ক. পশু–পাখি

আদিকাল থেকে অখন্ড ভারত ছিল। হিন্দু- মুসলমান একসাথে মিলেমিশে থাকতো। সূচিনকশার মোটিফে যে পশু পাখির চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তার অনেকগুলোই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেব–দেবীর বাহন হিসেবে দেখা যায়। যেমনঃ ময়ূর-কার্তিকের বাহন, হাতি-গণেশের বাহন, পেঁচা-লক্ষ্মীর বাহন, এই কারণে পশু–পাখি চিত্রণে ধর্মীয় আবেগ প্রাধান্য পাচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে এ বিষয়টি হিন্দু মেয়েদের পক্ষে যৌক্তিক হলেও মুসলিম মেয়েদের পক্ষে অযৌক্তিক। তারা এসকল চিত্র বা মোটিফকে স্বাভাবিকভাবেই অর্থাৎ কোন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে ব্যবহার করে আসছে। সুতরাং, এক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাব–ধারা যেমন আছে, তেমনি আছে পছন্দের বিষয়। এসকল মোটিফ ধর্মীয় অনূভুতি ও প্রকৃতির বিষয় হিসেবেই ধরে নেয়া যায়। পশু-পাখি বা জীব-জন্তুকে প্রকৃতির অংশ হিসেবেই ধরে নেয়া হয়। যার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। (চিত্রঃ ২১)।

খ. পদ্ম ফুল

বার্ডস আই ভিউতে পুষ্পিত পদ্ম ফুলের মোটিফ অধিক দেখা যায়। এক্ষেত্রে ২টি বিষয় প্রাধান্য পেতে পারে–এক: ধর্ম, দুই: প্রকৃতি।

ধর্ম: হিন্দু ধর্মে পদ্ম ফুল একটি পবিত্র ফুল হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'দূর্গা পূজায়' ব্যবহৃত হয়। তাই ধারণা করা হয়, পূর্ণফোটা পদ্মকে দেখানোর জন্যই এমন নকশার আবির্ভাব।

প্রকৃতি: অন্যদিকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা অর্থাৎ, নদীমাতৃক দেশে 'শাপলা–পদ্ম' গ্রাম–বাংলার খালে-বিলে, নদী-নালায় সারা বছর বিস্তৃত থাকে। যা গ্রামীণ মানুষের জীবন–যাত্রার সাথে নিত্য সম্পর্কিত। বিলে–ঝিলে ফোটা লাল পদ্মের চিত্র যে কোন মানুষের মনে আনন্দের সুখানুভূতি জাগ্রত করে। তাই, এক্ষেত্রে পদ্মকে মোটিফ হিসেবে দেখতে পাওয়া প্রকৃতির উৎস হতে পারে। (চিত্র: ২২)।

গ. গ্রাম বাংলার দৃশ্য

গ্রাম–বাংলার দৃশ্য বলতে কুঁড়ে ঘর, বট গাছ, নদীর ধার, সারিবদ্ধ নৌকা ইত্যাদি দৃশ্য ধরা দেয় যা বাংলার গ্রামীণ রূপের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং দৃষ্টিনন্দন বাসভূমির দৃশ্যকে ফ্রেম বন্দী করার প্রয়াস থেকেই সাধারণত এই মোটিফের সৃষ্টি। (চিত্র: ২৩)।

ঘ. জীবনবৃক্ষ

ফুল–ফল, পাখি সম্বলিত বৃক্ষ বা বট বৃক্ষের আদলে গাছের চিত্রকে জীবনবৃক্ষ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কারণ, এসব উপকরণের উপর প্রাণের সঞ্চার ঘটে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ছায়া, বাতাস, আশ্রয়, খাদ্য, প্রেম সব কিছু এই ধরনের গাছ বা বৃক্ষের মাঝে পাওয়া যায়। এখানে: ফুল–পাখি প্রেমের প্রতীক, ফল জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান উপকরণের প্রতীক, বৃক্ষ আশ্রয়ের প্রতীক। তাই এর নাম হল জীবনবৃক্ষ। (চিত্র: ২৪)।

ঙ. ইসলামিক নকশা

চাঁদ, তাঁরা, সূর্য, মসজিদ, মসজিদের মিনার, দোলায়িত পুষ্পিত লতাকে ইসলামিক নকশা বলার কারণ মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ এবং মিনার প্রায় সব মসজিদের নকশাতেই শোভা পায়। তাই ধর্মীয় আবেগ ও ভাবধারায় এই নকশার আবির্ভাব। এছাড়া ইসলাম ধর্মের অধিকাংশ রীতি রেওয়াজ চাঁদকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে যেমন–শাওয়াল মাসের প্রথম চাঁদে 'ইদ'। এসব ধর্মীয় রীতি–নীতির প্রভাব সূচিনকশার মোটিফে তাই দেখা যায়।

যেহেতু ইসলাম ধর্মে প্রাণির ছবি অঙ্কন নিষিদ্ধ সেহেতু, প্রাকৃতিক ফুল–লতাপাতা, বিশেষ করে দোলায়িত পুষ্পিত লতার মোটিফ দেখা যায়। যেমন: জায়নামাজের মাঝে মসজিদের মিনার আর তার চারিধারে লতার নকশা শোভা পায়। এখানে প্রকৃতিতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মসজিদ প্রাঙ্গনে সুন্দর সাজানো ফুলের বাগান করা হয়ে থাকে। ফলে এভাবেই নকশাগুলোর সমন্বয় সাধিত হয়। (চিত্র:২৫)।

চ. সামাজিক চিত্র

কৃষি সরঞ্জাম, রান্নাঘরের সামগ্রী, উৎসব চিত্র এসবই সমাজে ঘটে চলা নিত্য ঘটনা। যার ফলে গ্রামীণ সমাজের চাল–চিত্রের প্রতিচ্ছবিগুলো মোটিফ আকারে সূচিনকশায় ধরা দেয়। (চিত্র: ২৬)।

ছ. মেয়েলি আবেগ

যেহেতু বাংলায় সূচিশিল্পের প্রধান কারিগর মেয়েদেরকে ধরা হয়, সেহেতু এখানকার সূচিনকশায় যে মেয়েদের নিত্য ব্যবহার্য ও আবেগ–ভালবাসার সাথে সম্পর্কিত বিষয়–সামগ্রীগুলো মোটিফ আকারে ধরা দেবে তা অবশ্যম্ভাবী। যেমন: আয়না, চিরুনী, অলঙ্কার ইত্যাদি নারীর নিত্য সঙ্গী। (চিত্র: ২৭)।

জ. আলপনা

গ্রামীণ সমাজের যে কোন শুভ কাজের সূচনা হয় আলপনার মাধ্যমে। সহজ–সরল মানুষের কামনা–বাসনার প্রতিকী রূপ আলপনা, পূজা–প্রার্থনাতে বিশেষ শৈল্পিক রূপে গৃহের আঙ্গিনায় বা গৃহ কাজে ফুটিয়ে তোলা হয় রেখাচিত্রের মাধ্যমে। আর তাই এই বিশেষ আলংকারিক রীতিটি অনায়াসেই চলে আসে সূচিনকশায় মোটিফ আকারে। কারণ, একজন শিল্পী যে কোন ধরনের সৌন্দর্যকেই ধারণ ও প্রকাশ করার জন্য সদা উদগ্রীব। তাই গ্রামীণ এই শৈল্পিক মাধ্যমটিও খুব সহজেই চিত্ররূপে ফুটে ওঠে নকশিকাঁথায়। যা বর্তমানে সূচিশিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিস্তরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। (চিত্র: ২৮)।

এছাড়াও বিভিন্ন আকার বা অবয়বের সাথে বিশেষ বিশেষ বাণী, শ্লোক, খনার বচন, ধর্মীয় বাণী, কবিতার স্তবক ইত্যাদিও সূচিনকশার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। যেখানে সূচিশিল্পী তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। তবে, বর্তমানে সূচিশিল্পের নকশায় এই ধরনের বিষয়বস্তু তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। এই ধরনের নকশা ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা বা পাকিস্তান আমলে বেশি দেখা যেত। (চিত্র: ২৯)।

২.৩ সূচিনকশার তাৎপর্য

সূচিশিল্পের জন্য যে নকশাগুলো নির্বাচন করা হয়, তা যে শুধুমাত্র সৌন্দর্য বর্ধন বা ব্যক্তি পছন্দের উপর ভিত্তি করে তা নয়। প্রতিটি নকশা ও মোটিফের রয়েছে বিশেষ অর্থ ব্যঞ্জনা। যেখানে শিল্পীর রসবোধ ও জীবনবোধের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে।

নিতান্তই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত সূচিশিল্প সামগ্রীতে এই ধরনের আবেগিক বিষয়গুলো উপেক্ষিত হলেও নকশায় সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার জন্য সূচিনকশার অর্থ জানা আবশ্যক। যেমন: মাছ–উর্বরতার প্রতীক, পাখি–প্রেমের প্রতীক, পানি–স্বচ্ছতা, হাতি–শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতীক, ময়ূর–কামনা ও সৌন্দর্যের প্রতীক, পদ্ম–পবিত্রতা ও প্রকৃতির প্রতীক, জীবনবৃক্ষ–প্রাণের প্রতীক এবং সজীবতার প্রতীক, পালকি–নতুন জীবনের প্রতীক বা নববধূর প্রতীক অর্থাৎ, যখন একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করা হবে, তখন প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই অর্থব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দিলে সূচিশিল্পে সৃষ্টিশীল ও মানসম্পন্ন নকশা দেখা যাবে।

২.৪ সূচিশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ

ঐতিহ্যবাহী সূচিশিল্প অর্থাৎ নকশি কাঁথার ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র বা ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে সুচ–সুতার সাহায্যে প্রথমে কাঁথাকে ছোট ছোট রান ফোঁড় দিয়ে তৈরি করে নেয়া হতো এবং পরবর্তীতে সেই পুরাতন কাপড়কে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন সজ্জামূলক নকশার ব্যবহার থাকতো। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আবহমান বাংলার যে লোকশিল্পের এক সমৃদ্ধ অধ্যায় নকশি কাঁথা- তার অন্যতম প্রধান উপকরণ পুরাতন কাপড়–মানুষের পরিধেয় বা ব্যবহার্য এমন ধরনের কাপড় যাকে আবারও পুনরায় ব্যবহার করতো কাঁথা তৈরির জন্য। বর্তমানেও প্রতিটি বাঙালি পরিবারেই কাঁথার প্রচলন রয়েছে এবং এখনও কাঁথা তৈরির উপকরণের ক্ষেত্রে একই রকম দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। তবে, পার্থক্য হল এখনকার নিত্য ব্যবহার্য কাঁথাগুলোতে সুচ–সুতার নকশা পূর্বের নকশি কাঁথার মত দেখা যায় না। কারণ, অতীতে যে কাঁথাগুলো তৈরি হতো, তাঁর অধিকাংশ কাপড়ের জমিন ছিল সাদা বা এক রঙা আর সেই শূণ্য জমিনকে গাঁয়ের বধূরা ভরিয়ে দিত বৈচিত্রময় নকশায়। কিন্তু, বর্তমানে আধুনিকতার যুগে কাপড়ের জমিনের নকশায় এবং রঙে অনেক পরিবর্তন আসায়, অধিকাংশ কাপড়ই থাকে রঙিন ছাপাযুক্ত। তাই বর্তমানে শুধুমাত্র কাঁথার গঠনমূলক ফোঁড়ের মাধ্যমেই অধিকাংশ নিত্য ব্যবহার্য কাঁথা তৈরি হচ্ছে। ফলে, নকশি কাঁথার প্রচলন তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। আর যেহেতু নকশি কাঁথা তৈরি অনেক সময় ও শ্রমসাধ্য বিষয় সেহেতু এখনকার নকশি কাঁথায় নতুন ও উন্নত মানসম্পন্ন কাপড় ব্যবহৃত হয়। পাঁচ হাত বহরের বেড শিট বা বিছানার চাদর বিশেষ করে লাল, সাদা, কালো এই তিন রঙের জমিনের উপর নকশি কাঁথার আদলে নকশি চাদর তৈরি করা হয়। (চিত্র: ৩০)।

এছাড়া অন্যান্য সূচিশিল্প যেমন: থ্রি–পিস বা জামা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সূচিশিল্প তৈরিতে সাধারণত বিচিত্র রঙের বেক্সি ভয়েল, অরবিন্দু ভয়েল, রাজশাহী সিল্ক, ধুপিয়ান সিল্ক, জর্জেট ইত্যাদি কাপড়ের ব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে গাঢ় রঙের কাপড়ের প্রাধান্য বেশি থাকে। (চিত্র: ৩১)।

কুশন কভার: কুশন কভারের ক্ষেত্রে ধুপিয়ান সিল্ক বা বিছানার চাদরের যে কাপড়, যেমন: থাই কটন ইত্যাদি বেশি ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রে হালকা রঙের কাপড় প্রাধান্য পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাল, নীল ও কালো জমিনের কাপড়ের ব্যবহার দেখা যায়। (চিত্র: ৩২)।

শাড়ি: বর্তমানে মসলিন, তসর সিল্ক, মটকা সিল্ক, হাফ সিল্কের শাড়িতে প্রচুর সূচিনকশার কাজ হচ্ছে। সুতির শাড়ির তুলনায় সিল্ক জাতিয় শাড়িতে অধিক সূচিকাজ দেখা যায়। (চিত্র: ৩৩)।

ব্যাগ: হ্যান্ডব্যাগ বা পার্সব্যাগের জন্য জুট কটনের উপরে, কাতান বা ধুপিয়ান সিল্কের বা সিনথেটিক কাপড়ে সূচিকাজ করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ব্যাগে চটের ব্যবহার দেখা যায়, যেখানে চটের উপরেও সূচিকাজ শোভা পায়। (চিত্র: ৩৪)।

গহনা: মহিলাদের ব্যবহার্য অলঙ্কার বিশেষ করে গলার মালার লকেট, কানের দুল ও হাতের বালা ইত্যাদি গহনায় সূচিকাজের প্রচলন দেখা যায়। যেখানে রঙিন সুতিকাপড় ব্যবহৃত হয়। (চিত্র: ৩৫)।

কার্পেট: সূচিকাজের কার্পেট, আসন ও পাপোশ তৈরির প্রধান উপকরণ চট। যেখানে বড় ছিদ্রযুক্ত মোটা সুচ ও রঙিন উলের সুতা দ্বারা নকশা তৈরি করা হয়। (চিত্র: ৩৬)।

দেওয়ালসজ্জা: সূচিনকশার দেওয়ালসজ্জায় চট ও সুতি কাপড়ের ব্যবহার বেশি দেখা যায় তবে কিছু কিছু উচ্চ মানসম্পন্ন সূচিশিল্পে প্রাকৃতিক সিল্ক কাপড় বা কৃত্রিম সিল্ক কাপড়ের ব্যবহার দেখা যায়। এক্ষেত্রে সাদা, লাল ও কালো রঙের জমিন প্রাধান্য পায়। কাপড়ের উপর সূচিনকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিচিত্র রঙের সুতার।

সুতা: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর সুতা যেমন–সুতি, রেশম, পশম, খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক তন্তুর রঙ-বেরঙের সুতা দ্বারা সূচিনকশাগুলোকে কাপড়ের জমিনে ফুটিয়ে তোলা হয়। কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে রয়েছে নাইলন, রেয়ন, প্যালেক্স ইত্যাদি সুতা।

সুতার রঙের মধ্যে উজ্জ্বল রঙগুলো প্রাধান্য পায় বেশি। তবে, নকশাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কালো, সাদা ও লাল রঙের সুতার ব্যবহার বেশি হয়। দুই বা ততোধিক রঙের শেড সুতাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইন্ডিয়া থেকে আসা সুতির সুতা ও উলের সুতা বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ, তুলনামূলকভাবে এসব সুতার গুণগতমান ভাল হয়। যেমন: রঙ নষ্ট হয় না, সহজে সুতা ছেঁড়ে না, সুতির সুতার সাধারণত-বিভিন্ন ব্র্যান্ড, যেমন-রোজ, এংকর, রাঙ্গোলি-১২০, ১৫০ থেকে শুরু করে ৫০০ নং পর্যন্ত ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়। তবে, সজ্জামূলক সূচিশিল্পে বেশি রেশমি বা সিল্ক সুতার ব্যবহার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সুতির সিল্ক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সিল্ক সুতা বা কৃত্রিম সিল্ক (প্যালেক্স) উভয় সুতারই ব্যবহার সমানভাবে হয়। (চিত্র: ৩৭)।

তবে, অতীতে সূচিশিল্পে বিশেষ করে নকশি কাঁথার যে সুতাগুলো ব্যবহৃত হতো তার সাথে কাঁথা তৈরিতে যে কাপড় দেয়া হতো এর মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল। কারণ, সাধারণত যে পুরাতন শাড়ি থেকে কাঁথা বানাতো, সেই শাড়িরই রঙিন পাড় অর্থাৎ পাড়ে যে রঙিন বিশেষ করে লাল, সবুজ, নীল, হলুদ রঙের সুতাগুলোকে খুলে খুলে সেই সুতা দিয়েই নকশি কাঁথা তৈরি করতো। বর্তমানে সূচিনকশার ক্ষেত্রে এ প্রথা বলা যায় একেবারেই বিলুপ্ত। এখন মানুষের কাছে সুতা অনেক বেশি সহজলভ্য ও বৈচিত্রপূর্ণ। তাই সূচিনকশার জন্য উপযুক্ত সুতা সূচিশিল্পীরা বাজার থেকেই সংগ্রহ করে থাকেন।

এই শিল্পের নামই হল সূচিশিল্প ইংরেজিতে Niddle Work অর্থাৎ নামেই রয়েছে সুচ। তাই সুচ যে সূচিশিল্পের প্রধান উপকরণ এবং এটি ছাড়া যে অন্যান্য উপকরণ কোন কাজেই আসবে না তা বলাই বাহুল্য। তবে, সুচ–সুতা ও কাপড় এই তিনটি উপাদনই সমানভাবে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। তাই সুচ ব্যবহারে কাপড়ের জমিন ও সুতার আকার বিবেচ্য। (চিত্রঃ ৩৮)। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে সুচের নির্দশন পাওয়া গেছে বিভিন্ন সভ্যতায়। গাছের সুচালো ডাল–পালা থেকে শুরু করে পশু–পাখির হাড়, লোহা, ব্রোঞ্জ সবকিছু দিয়েই যুগ যুগ ধরে সুচ তৈরি হয়েছে। এমনকি মূল্যবান ধাতু সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদিও উন্নতমানের সুচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। (চিত্রঃ ৩৯)।

সূচিনকশার জন্য যে সুচ ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুচের নাম হল সোনামুখি, যশোর স্টিচ সুচ। সুচের আকার ও সুচের ছিদ্রের আকারের উপর ভিত্তি করে নম্বর দেয়া থাকে, যেমনঃ ৫নং,৬নং,৭নং,৮নং প্রভৃতি। তবে, সূচিকাজের জন্য যশোর স্টিচ ৮নং সুচের ব্যবহার বেশি করা হয়। (চিত্রঃ ৪০)।

উলের সুতার জন্য লোহা বা ব্রোঞ্জের চট সেলাইয়ের সুচ বেশি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রেও চটের জমিনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুচের আকৃতি নির্বাচন করা হয়। (চিত্রঃ ৪১)।

আনুষঙ্গিক উপকরণ

সূচিনকশাকে দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে সুতা ছাড়াও জরি, চুমকি, আয়না, কাঁচ, পুঁতি, পাথর, কুন্দন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়। এসব উপাদান ব্যবহারের ফলে সূচিনকশায় ভিন্নমাত্রা যোগ হয়। যেখানে জরি, চুমকি, পুঁতি, পাথর, কুন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করে চকচকে ও ত্রিমাত্রিক জমিন সৃষ্টি করা যায়। অন্যদিকে আয়না, কাঁচ ইত্যাদি উপকরণ দ্বারা স্বচ্ছ জমিন সৃষ্টি করা যায়। (চিত্রঃ ৪২)।

এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল বিভিন্ন মাপের ফ্রেম। উপযুক্ত ফ্রেমে আটকিয়ে কাপড়টিকে টানটান করে সূচিনকশা তোলা হয়। এর ফলে সূচিকাজ নিখুঁত হয়; কাপড় বা সুতা কুঁচকে যায় না। (চিত্র: ৪৩)।

২.৫ সূচিশিল্পে ব্যবহৃত ফোঁড়

এই শিল্পের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় অংশ হল ফোঁড়। যে কোন ধরনের নকশাকে কাপড়ের জমিনে ফুটিয়ে তুলতে এবং প্রাকৃতিক চিত্রসমূহ জীবন্ত রূপে তুলে ধরতে সূচিকাজের বিভিন্ন ফোঁড় মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

লোকশিল্প নকশিকাঁথায় যে ধরনের ফোঁড় দেখা যায়, তাকে প্রথাগত (ট্রেডিশনাল) বা কাঁথা স্টিচ বলে আখ্যা দেয়া হয়। বর্তমানে যে সূচিশিল্পগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে অধিকাংশ ফোঁড়ই এই ঐতিহ্যবাহী কাঁথা স্টিচ বা কাঁথা ফোঁড়ের দ্বারা হয়ে থাকে। তবে, এছাড়াও অন্যান্য ফোঁড়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রথাগত ফোঁড়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- কাঁথা ফোঁড়
- কাস্তে ফোঁড়
- ভরাট ফোঁড়
- ডাল ফোঁড়
- লহর তোলা ফোঁড় বা নকশি পাড়
- কবুতর খোঁপী
- ক্রস ফোঁড়
- চেইন ফোঁড়

এছাড়াও অন্যান্য আধুনিক অনেক ফোঁড় উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলো সূচিকাজে অত্যধিক প্রচলিত যেমন:

- লেজি- ডেজি
- ফ্রেঞ্চনট
- যশোর স্টিচ
- উল্টো ক্রস
- গোকুল ফোঁড়
- ফেদার স্টিচ
- মাছ কাটা

- ডাবল চেইন
- গুজরাটি
- বুনন
- হানিকম্ব
- এপ্লিক
- কাটওয়ার্ক

ইত্যাদি।

আধুনিক সূচিনকশায় অনেক সময় বিশেষ প্রক্রিয়ায় নকশাগুলোর জমিনকে ত্রিমাত্রিক রূপ দেয়া হয়। যা তুলনামূলকভাবে অধিক আকর্ষণীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়। (চিত্র: ৪৪)।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য ফোঁড়সমূহের বর্ণনা দেয়া হল–

ক. চেইন ফোঁড়

চেইন বা শিকলের মত দেখায় বলে একে চেইন ফোঁড় বলে। প্রথমে ডান থেকে বাম দিকে সেলাই করতে হবে, এতে সুতা কাপড়ের সাথে আটকে যায়। এরপর আটকানো সুতার ঠিক গোড়া থেকে সুচ ফুটিয়ে আবার বাম দিকে ফোঁড় তুলতে হবে এবং সুতা দিয়ে সুচের আগায় ফাঁস দিতে হবে। এরপর সুচ টানলে সুতাটি চেইনের একটি অংশের মত দেখাবে। এখানে পূর্বের পদ্ধতিতে বারবার করার পর চেইন সেলাই সম্পূর্ণ হবে।(চিত্র: ৪৫)।

খ. রান ফোঁড়

বিভিন্ন রকম ফোঁড় এর মাঝে সবচেয়ে সহজে যে ফোঁড়টি ব্যবহার করা হয় তা হল রান ফোঁড়। হাতে তৈরি পোশাক জোড়া দিতে, জামায় কুচি দিতে এ ফোঁড় ব্যবহার করা হয়।

সুচে সুতা ভরে কাপড়ের ওপর নিচ দিয়ে সুচ সমানভাবে প্রবেশ করিয়ে টানা সেলাই দিতে হবে। কাঁথা সেলাইয়ের জন্য এ ফোঁড় ব্যবহার করা হয় বলে একে কাঁথা স্টিচও বলে। (চিত্র: ৪৬)।

গ. কেবল ফোঁড়

সাধারণত বিভিন্ন নকশার কিনারায় এ ফোঁড় দেখা যায়। পাশাপাশি ও নিচে একইভাবে রান ফোঁড় দেয়া হয়। তবে উপরের সুতা নিচের সুতা অপেক্ষা একটু বেশি লম্বা থাকে। (চিত্র: ৪৭)।

ঘ. আটি বাঁধা ফোঁড়

জামা বা অন্যান্য কাপড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই ফোঁড় উপযোগী। এই ফোঁড়ের জন্য প্রথমে ৩টি প্রাথমিক সেলাই বা প্রচলিত ভাষায় টাক (ছোট রান ফোড়) সেলাই দেয়া হয়। এরপর মাঝের ফোঁড়

বরাবর সুচ তুলে ফোঁড় ৩টি একত্রে একটি সুচের সাহায্যে শক্তভাবে জড় করে সুচ নিচে নিয়ে কাপড়ের সাথে আটকে দেয়া হয়। (চিত্র: ৪৮)।

ঙ. ডাল ফোঁড়

কোন সরু বাঁকা লাইন জড়াতে অথবা গাছের ডাল বা লতা করতে হলে ডাল ফোঁড় দিতে হয়। এই ফোঁড় তুলতে হয় সুচের বাম দিক থেকে বাঁকা করে, বাম পাশের ফোঁড়ের দিক থেকে সামনে বাড়িয়ে ডান পাশে সুচ তুলতে হবে এই ফোঁড় দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি ফোঁড় সমান দূরত্বে হয়। (চিত্র: ৪৯)।

চ. ভরাট ফোঁড়

কোন নকশা ভরাট করতে হলে ভরাট ফোঁড় দেয়া হয়। নকশার উপর অনবরত পাশাপাশি ছোট বড়, বাঁকা সেলাই দিয়ে ভরিয়ে দেয়াকে বলা হয় ভরাট সেলাই বা ভরাট ফোঁড়। ভরাট ফোঁড় দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি সুতার টান সমভাবে থাকে এবং একটার ওপর আরেকটা না পড়ে। (চিত্র: ৫০)।

ছ. লেজি ডেইজি ফোঁড়

এই ফোঁড় দেখতে অনেকটা ফুলের পাপড়ির মত, ছোট ফুলের পাপড়ি তৈরি করতে এ ফোঁড় ব্যবহৃত হয়। একটি বড় ফোঁড় করে তার উপরের অংশ একটি ছোট ফোঁড় করে এ সেলাই কাপড়ের সাথে আটকানো হয়। (চিত্র: ৫১)।

জ. ক্রস ফোঁড়

কাপড়ের উপর দুই লাইনের মধ্যে দিয়ে প্রথমে বাম দিক থেকে ডান দিকে হেলানভাবে সেলাই করতে হবে এবং পরে ডান দিক থেকে বাম দিকে হেলানভাবে সেলাই করতে হবে। ফলে দুটি সেলাই এর মাঝে একটি ক্রসের সৃষ্টি হয়। জায়নামাজ, চট, কার্পেট, ব্যাগ, কুশন কভার ইত্যাদির উপর এই সেলাই করা হয়। (চিত্র: ৫২)।

ঝ. হেরিংবোন ফোঁড়

এই সেলাই সাধারণত ভারী কাপড়, উলের কাপড় ও জ্যাকেট ইত্যাদির ওপর করা হয়। এটি বাম দিক থেকে ডান দিকে করা হয়। কাপড়ের ওপর সুতা আটকে নিচের দিক হতে বাম দিকে একটা ফোঁড় তোলা হয়। আবার ওপর দিক হতে ডান থেকে বাম দিকে একটা ফোঁড় তোলা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উপরের এবং নিচের সেলাই সমান দূরত্বে থাকে। নিচের ফোঁড় তোলার সময় সুতা সুচের ওপর দিকে এবং ওপরের ফোঁড় তোলার সময় সুতা সুচের নিচের দিকে রাখতে হয়। (চিত্র: ৫৩)।

ঞ. ফেদার ফোঁড়

ফেদার অর্থ পালক। এটি দেখতে পাখির পালকের মত হয়। পাখির পালকের মত একের পর এক সাজিয়ে সেলাই করা হয় বলে একে পালক ফোঁড় বা ফেদার স্টিচ বলা হয়। এই সেলাই এর ক্ষেত্রে প্রথমে সুচ কাপড়ের নিচের দিক থেকে উপরে তোলা হয়। আবার সুতার বাম পাশে সামান্য দূর থেকে সুচের ভিতরের দিকে দুই সেলাইয়ের মাঝ বরাবর কিছুটা সমানভাবে ঢিলা রেখে সুচ টানতে হয়। এরপর গোড়ার সুতা বাম পাশে প্রথম ও দ্বিতীয় ফোঁড়ের সমান দূরত্বে আবার সুচ ভিতরে দুই সেলাইয়ের মাঝ বরাবর আগের মত তুলতে হবে। এভাবে পূর্বের নিয়মে সেলাই সম্পন্ন করতে হয়। (চিত্রঃ ৫৪)।

ট. ফ্রেঞ্চ নট

ফ্রেঞ্চ নট ফোঁড় দিয়ে গোলাপের পাতা ও অন্যান্য ছোট ছোট সজ্জামূলক সেলাই করা হয়। এই সেলাই এর ক্ষেত্রে নকশার নির্দিষ্ট স্থানে সুচ কাপড়ের নিচের দিক থেকে উপরের দিকে অর্ধেক তুলে সুতা সুচের সাথে তিন-চারবার পেঁচিয়ে যে স্থান দিয়ে সুচ উঠেছিল তার সামান্য দূরে গিয়ে সুচ নিচের দিকে শক্ত করে টেনে নিতে হবে। এতে করে ওপরে একটা নট বা গিট পড়বে। সেটাই ফ্রেঞ্চ নট। (চিত্রঃ ৫৫)।

ঠ. মাকড়শার জাল ফোঁড়

একটি ধাতব মুদ্রার সমান বৃত্তকে আটটি লম্ব রেখা দিয়ে ভাগ করে, রেখা বরাবর সুচ-সুতা উপর থেকে নিচে তিন থেকে চারবার টানা সেলাই দিতে হবে। যা দেখতে চাকার মত হবে। এরপর এই লম্বা আকৃতির উপর নীচে সুতা নিয়ে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে ভরাট করতে হবে; দেখা যাবে যে তা মাকড়সার জালের আকার পেয়েছে। (চিত্রঃ ৫৬)।

ড. বোতাম ঘর ফোঁড়

কাপড়ে সমান্তরালভাবে দুটো দাগ দিয়ে নীচের দাগ হতে সুতা তুলে উপরের দাগ দিতে হবে এবং সুচে সুতা পেঁচিয়ে ফাঁস তৈরি করে বোতাম ঘর ফোঁড় দেওয়া হয়। (চিত্রঃ ৫৭)।

ঢ. হুইল স্টিচ

বৃত্তাকারে পাশাপাশি রান ফোঁড় দিয়ে এই সেলাই করা হয়। তবে কেন্দ্র থেকে রান ফোঁড়গুলো বাইরের দিকে ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। (চিত্রঃ ৫৮)।

এই ধরনের বিভিন্ন ফোঁড় ব্যবহার করে কুশান কাভারে বা ব্যাগে নকশা করা যায়। (চিত্রঃ ৫৯)।

ঢ. নকশি পাড়

সাধারণত নকশি কাঁথার পাড়ে এই ধরনের নকশা দেখা যায় এবং এই পাড়ের নকশাগুলো একই নিয়মে করা হয়ে থাকে। প্রথমে পাড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী প্রয়োজনমতো কয়েক সারি 'কেবল ফোঁড়' বা 'কাঁথা ফোঁড়' দিতে হয়। এরপর শুধুমাত্র এই ফোঁড়ের উপরে নকশানুযায়ী সুচ-সুতা দিয়ে বুনন করে বিভিন্ন প্রকার আকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়। এরকম কয়েকটি নকশি পাড়ের নাম হলো– চোখ পাড়, চিক পাড়, লহর তোলা, শামুক পাড় ইত্যাদি। (চিত্র: ৬০)।

এপ্লিক পদ্ধতিতে সূচিনকশা

এপ্লিক পদ্ধতিতে সূচিনকশা তৈরির সুবিধা হলো রঙিন সুতার পরিবর্তে রঙিন কাপড় ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রকমের ফোঁড় ব্যবহার করে সেলাই করতে যে পরিমাণ সময় লাগে এপ্লিক করতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে। এই এপ্লিকের জন্য নানা রঙের টুকরা কাপড় ব্যবহার করতে করা হয়।

কাপড়ের ব্যবহারের সাথে মিল রেখে একটি নকশা করতে হবে। নকশার বিভিন্ন অংশের জন্য রঙিন কাপড় সংগ্রহ করতে হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ জমিনের কাপড় এপ্লিকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে পছন্দ মাফিক নকশা এঁকে সেই নকশা অনুযায়ী কাপড় কেঁটে 'বোতাম স্টিচ' বা 'ব্লাইন্ড হেম স্টিচ' এর মাধ্যমে লাগানো হয়।

নকশাটি যদি বোতাম ঘর সেলাই দিয়ে বসানো হয় তবে নকশার পাশ দিয়ে রঙিন কাপড় কাঁটতে হবে। 'হেম ফোঁড়' দিয়ে নকশা যুক্ত রঙিন কাপড় যদি বসানোর পরিকল্পনা থাকে তবে রঙিন কাপড়ের পাশের কাপড় অল্প বেশি রেখে নকশাটি কাটতে হবে, যেন নকশার পাশের কাপড় ভিতরের দিকে সামান্য ভাঁজ করে এর উপর ব্লাইন্ড হেম করা যায়।

নকশা করতে রঙিন কাপড়ের সাথে রঙের মিল রেখে একই সুতা বা অন্য কোন মানানসই রঙের সুতা ব্যবহার করতে হয়। এপ্লিক পদ্ধতির এক দিক দিয়ে সুবিধা হলো বিভিন্ন রঙের বা বিভিন্ন বর্ণের কাপড় ব্যবহার করা যায় এবং তুলনামূলক অন্যান্য স্টিচের থেকে এতে কম সময় লাগে। (চিত্র: ৬১)।

কাটা কাজ পদ্ধতিতে সূচিনকশা

কাটা কাজ পদ্ধতিতে খুব সূক্ষ্মভাবে আকর্ষণীয় নকশা তৈরি করা সম্ভব। কাটা কাজে নকশার বিশেষ বিশেষ অংশ কেটে ফেলে আকর্ষণীয় শিল্প সৃষ্টি করা হয়। সেই কারণে নকশাটিতে যাতে কাটার সুযোগ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাপড়ে নকশা এঁকে নেয়ার পর নকশার পাশ ঘেষে ছোট ছোট রান সেলাই করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী নকশার মাঝখানের অংশ কিছুটা কেটে দেওয়া হয়। এরপর কাটা অংশের পাশগুলো ভিতর দিকে কিছুটা ভাঁজ করে নিয়ে এর উপর দিয়ে হেম ফোঁড়

দিতে হবে। কাটা কাজ করার জন্য কোন কোন সময় বোতাম ঘর ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। এতে নকশার কাটা অংশের উপর দিয়ে বোতাম ঘর ফোঁড় দিতে হবে।

এই কাটা কাজ নকশায় গৃহসজ্জার নানা রকম সামগ্রী পোশাক-পরিচ্ছদ ও দেওয়ালসজ্জা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যায়। (চিত্রঃ ৬২)।

সূচিনকশা তৈরি পদ্ধতি

সূচিনকশা সুন্দর, মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অবশ্যই এর নিয়ম মেনে বা পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি করা উচিৎ। নিম্নে নকশা তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

- সূচিনকশা করার জন্য প্রথমে বস্তুর ব্যবহারের সাথে মিল রেখে একটি নকশা নির্বাচন করতে হবে।
- কাপড় বা যে বস্তুর উপর সূচিনকশা করা হবে, নকশাটি তার ওপরে এঁকে নিতে হবে। নকশা অনেক সময় খালি হাতেও আঁকা যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কার্বন পেপারও ব্যবহার করা হয়।
- নকশার যে অংশে রঙ ব্যবহার করা হবে সেই রঙের সুতার সঠিক ব্যবহার করতে হবে। কাপড়ের জমিন যদি ভারী বা পুরু হয় সেক্ষেত্রে মোটা সুতার ব্যবহার করতে হবে। আর যদি পাতলা বা মসৃণ জমিনের হয় তবে তার জন্য চিকন ও মসৃণ জমিনের সুতা ব্যবহার করতে হবে।
- নকশার বিভিন্ন অংশে যে স্টিচ বা ফোঁড় আছে তা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে।
- কাপড়ের ওপর নকশা আঁকা হয়ে গেলে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রঙের সুতা ও ফোঁড় ব্যবহার করে কাজ শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, কাজগুলো যেন অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করা হয়।
- সেলাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গেলে আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে নকশার সব জায়গায় সেলাই ঠিক মত করা হয়েছে কিনা।
- এপ্লিক পদ্ধতিতে সেলাই করার সময় কাপড়ের নকশা অনুযায়ী রঙিন কাপড় নির্বাচন করে তার ওপরে নকশা এঁকে নিতে হবে। এরপর ধারালো কাঁচি দিয়ে নকশাটি কেটে নিয়ে হেম অথবা বোতাম ফোঁড় দিয়ে সেলাই করে কাপড়টি বসিয়ে দিতে হবে।
- কাটা কাজের ক্ষেত্রে কাপড়ের ব্যবহারের সাথে মিল রেখে নকশা নির্বাচন করতে হবে। কাটা কাজের নকশার বিশেষ অংশ কেটে ফেলে আকর্ষণীয় শিল্প সৃষ্টি করা হয়। সেই কারণে নকশাটি যাতে কাটার সুযোগ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে সূচিনকশায়

প্রথমে কাপড়ের নকশা এঁকে নিতে হবে। নকশার পাশ ঘেষে ছোট ছোট রান সেলাই করতে হবে। পরবর্তীতে নকশা অনুযায়ী স্টিচ বা ফোঁড় ব্যবহার করে মাঝখানের অংশগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে।

- সূচিনকশার কাজ শেষ হলে কাপড়টির উল্টো দিকে বেশি হিট দিয়ে ইস্ত্রি করে দিতে হবে। এতে করে সেলাইগুলো খুব সুন্দর ও মসৃণভাবে কাপড়ের ওপর বসে যাবে।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও হস্তজাত সূচিশিল্পের সাথে সাথে মেশিনের মাধ্যমে তৈরি সূচিনকশা দেখতে পাওয়া যায়। যা খুবই প্রচলিত, তবে একই ধরনের সূচিনকশা ও উপকরণ হলেও তৈরি পদ্ধতি সূচিশিল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যার জন্য মেশিনে তৈরি এই ধরনের সূচিনকশার মতো কাজকে মেশিন এমব্রয়ডারি বলা হয়। যে কারনে মেশিন এমব্রয়ডারিকে সরাসরি সূচিশিল্পের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, হাতে তৈরি সূচিনকশার সাথে এর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। (চিত্রঃ ৬৩)। এটি তৈরিতে তুলনামূলকভাবে সময় কম লাগে, নিখুঁত হয়, পরিশ্রম কম হয়। কিন্তু তারপরও সূচিশিল্পে হস্তজাত সূচিশিল্প বেশি সমাদৃত কারণ এখানে ব্যক্তির আবেগ ও কারিগরি দক্ষতা বেশি প্রকাশ পায়।

২.৬ সূচিনকশা অঙ্কন পদ্ধতি

যে কোন সূচিশিল্প তৈরিতে কাপড়ের জমিনে প্রথমে নির্বাচিত নকশাটি অঙ্কন করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে যারা ছবি আঁকায় দক্ষ তারা সরাসরি কাপড়ের উপর কালি, পেন্সিল বা রঙ দিয়ে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করে দিতে পারেন। তবে, ব্যবসায়িকভাবে যারা অধিক কাজ করেন বা একই নকশায় অনেক বেশি সংখ্যক কাজ করেন এক্ষেত্রে নকশাগুলোকে আগে হাফ শিট বা ফুলশিট আকারের ট্রেসিং পেপারে এঁকে নেয়া হয় কলম বা পেন্সিল দ্বারা। এরপর তা থেকে কাপড়ে কার্বন পেপারের মাধ্যমে নকশাটির ছাপ দেয়া হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নকশার কাগজটি নকশা বরাবর ছোট ছোট ছিদ্র করে সেখানে করোসিন ব্যবহারের মাধ্যমেও কাপড়ে ছাপ দিয়ে নকশা তুলে নেয়া হয়।

সূচিকাজে আগ্রহী প্রায় সকলের নিকটই এই ধরনের নকশার কাগজ অনেক যত্ন সহকারে সংরক্ষিত থাকে। এ ধরনের নকশার কাগজ বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। (চিত্রঃ ৬৪)।

তৃতীয় অধ্যায়

জেলাভেদে সূচিশিল্পের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের সবর্ত্রই প্রায় একই ধরনের মোটিফ ও প্যাটার্নের সূচিকলা দেখতে পাওয়া যায়। তারপরও নকশা বিন্যাসে কিছু পার্থক্য রয়েছে। দেশের একই বিভাগের অন্তর্গত হয়েও জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন বৈচিত্র দেখা যায়। নিম্নে জেলা অনুযায়ী সূচিশিল্পের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হল:

০১. খুলনা জেলা

সূচিশিল্পের বিভিন্ন কাজের জন্য খুলনা সদরে উপকরণ সামগ্রী সাধারণত ইন্ডিয়া এবং যশোর থেকে আনা হয়। বিশেষ করে সূচিশিল্পের প্রধান উপকরণ সুতা। কারণ, খুলনা জেলায় কাজের উপযোগী সুতা খুব বেশি পাওয়া যায় না। সাধারণত গাঢ় রং এর সিল্ক সুতা বা রেশমী সুতা এবং সুতির সুতা ব্যবহার করা হয় সূচিকাজের জন্য।

বিভিন্ন ধরনের সূচিশিল্প যেমন: থ্রি–পিস, শাড়ি, নকশি কাঁথা, চাদর ইত্যাদি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে থ্রি–পিসের জন্য মদিনা ভয়েল, অরবিন্দু ভয়েল ইত্যাদি সুতি কাপড়কে প্রাধান্য দেয়া হয়।

নকশি কাঁথার থেকে নকশি চাদরের চাহিদা তুলনামূলক বেশি। তবে, খুব সৌখিন সামগ্রী হিসেবেই এই নকশি চাদর সমাদৃত হয়। ট্রেডিশনাল নকশি কাঁথার নকশার আদলে ও ফোঁড়ের মাধ্যমেই নকশি চাদর তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে, খুলনা সদরে সূচিশিল্পের মধ্যে থ্রি–পিস ও পাঞ্জাবী বেশি জনপ্রিয়। সাধারণত ফ্লোরাল মোটিফের নকশাই পোশাকে শোভা পায়। গাঢ় রঙের জমিনে ভরাট ফোঁড়, গিট ফোঁড়, কাঁথা ফোড় ও যশোর স্টিচের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। খুলনা জেলাতে ব্লক–বাটিকের প্রচলন তুলনামূলক বেশি হওয়ায় এ ধরনের পোশাকের উপরে ব্লকের নকশার সাথে সাথে বা বাটিকের রঙিন জমিনকে ফুটিয়ে তুলতে সুচ–সুতার নকশা লক্ষ্য করা যায়। একটি সাধারণ ব্লকের থ্রি–পিসের থেকে ব্লকের উপরে সুচ–সুতার কাজের থ্রি–পিসের মূল্য বেশি হয়ে থাকে। (চিত্র: ৬৫)।

এপ্লিক ও কাটওয়ার্কের থ্রি-পিস এবং বিছানার চাদরে আলপনা মোটিফ, জামিতিক নকশা ও ফ্লোরাল মোটিফ দেখা যায়। এ ধরনের কাজে সাধারণত কাপড় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নকশাগুলো কাপড়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। সুতার ব্যবহার দুই ভাবে হয়ে থাকে:

ক) কিছু কিছু নকশায় সুতাগুলো এমনভাবে সেলাই করা হয় যেখানে বাইরে থেকে সুতা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে কাপড়ের রঙের সাথে মিলিয়ে সুতার রং নির্বাচন করা হয় এবং হেম ফোঁড়ের মাধ্যমে সুতার ফোঁড়গুলো চোখের আড়াল করে রাখা হয়।

খ) অন্যদিকে নকশা অনুযায়ী কাটা কাপড়গুলোকে বোতাম স্টিচ বা কেবল ফোঁড়ের মাধ্যমে কাপড়ের বিপরীত রঙের সুতা ব্যবহার করে নকশা ফুটিয়ে তুলে ও এপ্লিক বা কাটওয়ার্কের কাজ করা হয়ে থাকে।

সুতার ক্ষেত্রে সুতির তাঁতের সুতা বেশি ব্যবহৃত হয়। এই সুতার সূচি ফোঁড়গুলো তুলনামূলক স্থুল ও কাপড়ের জমিন থেকে নকশার জমিন উঁচু বা ত্রিমাত্রিক রূপের হয়ে থাকে। যে স্টাইলটি ট্রেডিশনাল সূচিকর্মের স্টাইল থেকে অনেকটাই আলাদা। এ ধরনের সূচিনকশায় সময় তুলনামূলক কম লাগে। অল্প কিছু সুতার টানে যেহেতু সুতাগুলো স্ফীত থাকে অর্থাৎ খুব বেশি মিহি বা সূক্ষ্ম সুতার কাজ নয়; সেহেতু নকশাগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যায়। (চিত্র: ৬৬)।

০২ যশোর জেলা

খুলনা বিভাগের তথা বাংলাদেশের মধ্যে যশোরের সূচিশিল্প সবার্ধিক বিখ্যাত। সূক্ষ্ম সুতার কাজ ও ট্রেডিশনাল নকশার জন্য এই জেলার সূচিশিল্পের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ জন্মের আগে থেকেই এলাকার মানুষ সূচিশিল্পের সাথে যুক্ত।

নকশি কাঁথা, নকশি চাদর, শাড়ি, দেওয়ালসজ্জা, কুশন কভার ইত্যাদির প্রচলন বেশি রয়েছে। কাপড়ের মধ্যে সিল্ক, ধুপিয়ান সিল্ক, মসলিন, তসর সিল্ক, বেক্সি ভয়েল ইত্যাদি বেশি ব্যবহৃত হয়। সুতার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম রেশমি সুতার প্রচলন বেশি। তুলনামূলকভাবে হালকা রঙের জমিন যেমন: সাদা, অফহোয়াইট, ক্রিম ইত্যাদি রঙের উপর বেশি কাজ হয়। তবে দেওয়ালসজ্জার ক্ষেত্রে লাল, কালো রঙ দেখা যায়। কুশন কভারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নকশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাপড়ের জমিনের রঙ নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

সিল্ক ও মসলিন শাড়িতে ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার মোটিফ এবং প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। যেমন: শাড়ির পাড় ও আঁচলে ট্রেডিশনাল নকশি কাঁথার পাড়ের নকশা যেমন: চোখ পাড়, বিছা পাড়, কাতাই পাড়, এক ফোঁটা পাড় ইত্যাদি নকশা পাওয়া যায়। আঁচল ও জমিনে ময়ূর, কদম ফুল, জীবনবৃক্ষ, কলকা ইত্যাদি মোটিফ দেখা যায়। কুশন কভারে, হাতি, পেঁচা, মাছ ইত্যাদির মোটিফ বেশি ব্যবহৃত হয়।

যশোরের নকশি কাঁথা এতটাই প্রসিদ্ধ যে, এ অঞ্চলের নকশি কাঁথায় যে ফোঁড়টি তুলনামূলক বেশি দেখা যায় সে ফোঁড়টিকে 'যশোর স্টিচ' বলা হয়। ছোট ছোট রান বা কাঁথা ফোড় দ্বারা কোন নকশার জমিনকে যে পদ্ধতিতে ভরাট করা হয়, তাকে মূলত যশোর স্টিচ বলে। (চিত্র: ৬৭)।

ছোট পার্স, হ্যান্ড ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগ ইত্যাদিতে সূচিনকশার ব্যবহার এখানে দেখা যায়। ছোট ছোট একক মোটিফের মাধ্যমে এই ধরনের ব্যাগে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণত যশোরের স্থানীয় বাজার ও ইন্ডিয়া থেকে সূচিশিল্পের জন্য উপযোগী সুতা সংগ্রহ করা হয়।

০৩. সাতক্ষীরা জেলা

যশোরের পরই গুণগত মানের দিক থেকে অবস্থান করছে সাতক্ষীরার সূচিশিল্প। ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার সাথে সাথে আধুনিক নকশা ও উপকরণ দ্বারা সূচিশিল্পে কিছু নিরীক্ষাধর্মী কাজ এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথাগত নকশার মধ্যে ময়ূর, হাতি, পাখি, ও জ্যামিতিক নকশা এবং 'তাগা' বা নকশি পাড়ের নকশাগুলো বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক নকশার মধ্যে বড়দিনকে উপলক্ষ করে চিত্র, গোলাপ ফুলের ঝাড়, অনেকটা পশ্চিমা স্টাইলের নকশার সূচিশিল্প পাওয়া যায়। কারণ, এখানে ইতালির নাগরিকদের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে হস্তশিল্পের প্রকল্প রয়েছে, সেখানে প্রচুর পরিমানে সূচিনকশার কাজ হচ্ছে, ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব এই অঞ্চলের নকশায় দেখা যায়। (চিত্রঃ ৬৮)।

সাধারণত নকশি চাদর, কুশন কভার ও বিভিন্ন আকৃতির এবং স্টাইলের ব্যাগ পাওয়া যায়। চামড়ার ব্যাগের সাথে সূচিনকশাকে মূখ্য করে আকর্ষণীয় ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। মোবাইল ব্যাগ, বটুয়া ব্যাগ, থলে ব্যাগ ইত্যাদিতে অভিনব নকশা ও ফোঁড় লক্ষ্য করা যায়। (চিত্রঃ ৬৯)।

তবে, সাধারণত সূক্ষ্ম সুতার মাধ্যমে ভরাট এবং ডাল ফোঁড়ের নকশা বেশি দেখা যায়। লাল, সাদা, কালো, সবুজ ইত্যাদি রঙের কাপড়ে বেশি কাজ করা হয়ে থাকে। খাদি কাপড়, মার্কিন কাপড় ও সুতি যেমনঃ বেক্সি ভয়েল, অরবিন্দু ভয়েল ইত্যাদি কাপড়ে বেশি কাজ হয়।

এছাড়াও শুধুমাত্র পুঁতি ও চুমকি বা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বিটস ব্যবহার করেও সূচিকাজের নকশা করা হচ্ছে। এ্যপ্লিক, কাটওয়ার্ক ও প্যাচওয়ার্কের কাজও বেশ জনপ্রিয়। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ফ্লোরাল মোটিফ বেশি ব্যবহৃত হয়। ট্রেডিশনাল মোটিফেও কাজ হয়ে থাকে। (চিত্রঃ ৭০)।

শাড়ি ও দেওয়ালসজ্জার বিভিন্ন নকশা দেখা যায়, শাড়ির নকশায় বেশি যশোর স্টিচ ও ফ্লোরাল মোটিফ দেখা যায়। দেয়ালসজ্জার ক্ষেত্রেও ছোট বড় হরেক রকম ফুলের ঝাড়, জবা ফুলের মোটিফ ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়া শীতকালীন পরিচ্ছদ শাল বা চাদরের উপরও সূচিনকশার কাজ দেখা যায়। চেইন ফোঁড়ের মাধ্যমে বিচিত্র রঙের ব্যবহার এইসব নকশায় বেশি শোভা পায়। শালের নকশায় পাকিস্তানি 'কাশ্মীরি' শালের নকশার প্রভাব বেশি দেখা যায়। এছাড়াও কলকা মোটিফের কাজ শালের জমিনে বেশ জনপ্রিয়। (চিত্রঃ ৭১)।

এ অঞ্চলে সূচিকাজের পাঞ্জাবীর কদর রয়েছে। বিশেষ করে ইদের সময় অধিকাংশ ঘরে পাঞ্জাবীতে সূচিনকশার কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে জ্যামিতিক মোটিফ ও লতানো পাতার মোটিফ বেশি ব্যবহৃত

হয়। জ্যামিতিক মোটিফগুলো সাধারণত গুজরাটি ফোঁড় দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়, আর লতার নকশাসমূহ ভরাট ও ডাল ফোঁড় দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়। (চিত্র: ৭২)।

এছাড়া চটের উপর সূচিনকশার মাধ্যমে বিভিন্ন জ্যামিতিক মোটিফ ও উল এবং ক্রস ফোঁড় দিয়ে নকশা করা হয়। দেয়াল সজ্জা, জায়নামাজ, কার্পেট, পাপোশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে, চটের উপর সূচিনকশা দেখা যায়। তবে, সাধারণত সমস্ত চটের জমিনকে ক্রস ফোঁড়ের মাধ্যমে আবৃত করে দেয়া হয়। কার্পেটের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক ও ফুলের মোটিফ, জায়নামাজের ক্ষেত্রে মসজিদ, মিনার, চাঁদ, পুষ্পিত লতা আর দেওয়ালসজ্জার ক্ষেত্রে পাখি, গাছ, ইউরোপিয়ান কটেজ, গোলাপ ফুল ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

০৪. কুষ্টিয়া জেলা

এখানে সাধারণত নকশি চাদর, থ্রি-পিস ও শালের মধ্যে সূচিকাজের প্রচলন রয়েছে। ট্রেডিশনাল মোটিফ যেমন: গ্রামীণ দৃশ্য, কুঁড়ে ঘর, খেঁজুর গাছ, নৌকা, কলসি, কুলা, কলকা, চাকা ইত্যাদি মোটিফের কাজ দেখা যায়। দেওয়ালসজ্জার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণি চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। যেমন: হাতি, হরিণ, শিয়াল, বিড়াল, বাঘ ইত্যাদি। নকশি চাদরের ক্ষেত্রে সাধারণত লাল রঙের জমিন ও ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার ফোঁড়গুলো ব্যবহৃত হয়। কাস্তে ফোঁড় ও রান ফোঁড় উল্লেখযোগ্য। (চিত্র: ৭৩)।

০৫. চুয়াডাঙ্গা জেলা

এই জেলাতে সাধারণত থ্রি–পিস, ওয়ান পিস, পাঞ্জাবী ও কুশান কাভারের কাজ হয়ে থাকে। নকশার মধ্যে ফ্লোরাল মোটিফ ও পটচিত্রের নকশার কাজ হচ্ছে।

০৬. বাগেরহাট জেলা

শিল্প–সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সুপরিচিত বাগেরহাট। বাগেরহাটের সূচিশিল্পে বেশি ভরাট ও যশোর স্টিচের কাজ দেখা যায়। মোটিফের মধ্যে বেশি ফ্লোরাল মোটিফ ও আলপনার নকশার কাজ রয়েছে। এছাড়া সৃজনশীল কিছু নকশা যেমন–পুতুল বা তরুণীর চিত্র, হাতের উপরে বসা পাখি, কোলে বীণা নিয়ে বসা এমন ধরনের চিত্রের দেওয়ালসজ্জা দেখা যায়।

০৭. নড়াইল জেলা

এই জেলাতে থ্রি–পিস, ওয়ান পিস, জামা, ওড়না ইত্যাদির উপর সূচিনকশার কাজ বেশি দেখা যায়। এখানকার সূচিনকশায় ফ্লোরাল ও কলকা মোটিফের কাজও লক্ষণীয়। জর্জেট, মসলিন ও অরগেন্ডি কাপড়ের উপর বেশি ভরা কাজের নকশাও রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সুতির সুতার ব্যবহার বেশি, ডাল ফোঁড়, ভরাট বা স্যাটিন ফোঁড় এবং উল্টো ক্রস ফোঁড়ের ব্যবহার বেশি হচ্ছে নকশাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে, এগুলো অনেকটা ইন্ডিয়ার চিকনকারী নকশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

০৮. মাগুরা জেলা

মাগুরা জেলাতে প্রায় সব ধরনের সূচিশিল্পই পাওয়া যায় তবে শাড়ি, থ্রি–পিস, কোটি এবং নকশি কাঁথার সংখ্যা বেশি। মোটিফের ক্ষেত্রে বেশিই ফ্লোরাল ও কলকা এবং আলপনা প্যাটার্ন প্রাধান্য পাচ্ছে। রেশমি সুতার ব্যবহারে যে কাজগুলো হচ্ছে সেখানে কাঁথা স্টিচ বা রান ফোঁড়ের ব্যবহার হচ্ছে, তবে তাঁতের বা সুতির সুতায় ভরাট, ডাল ফোঁড়, ক্রস ফোঁড় ইত্যাদির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এখানের সূচিনকশাগুলো বর্তমানে ইন্ডিয়ান ফুলকারী নকশার আদলে তৈরি হচ্ছে। (চিত্রঃ ৭৪)।

০৯. ঝিনাইদহ জেলা

প্রথাগত নকশা ও সূক্ষ্ম সুতার কাজ এই জেলায়। নকশি কাঁথা থেকে শুরু করে শাড়ি, থ্রি-পিস, নকশি চাদর, গৃহসজ্জার অন্যান্য উপাদানও তৈরি হচ্ছে সূচিশিল্পে। রেশমি সুতা বা সিল্ক সুতার সূক্ষ্ম কাজ এবং কাঁথা ফোঁড় ও ভরাট ফোঁড়ের প্রচলন লক্ষণীয়। কাঁথার নকশায় বড় বড় ফুলের মোটিফ ও প্যানেল ভিত্তিক কাজ বেশি দেখা যায়। কলকা, কুলা, চক্র, কদম, কুমড়ো ফুল ইত্যাদি মোটিফ ও কাস্তে ফোঁড়ের ব্যবহার নকশি চাদরে বেশি করা হয়। (চিত্রঃ ৭৫)।

১০. মেহেরপুর জেলা

খুলনা বিভাগের মধ্যে মেহেরপুর জেলায় সূচিশিল্পের কাজ অন্যান্য জেলা থেকে তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। তবে, এই জেলার নকশি কাঁথা বেশ জনপ্রিয়। এসব নকশি কাঁথা তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে পুরানো লুঙ্গি, শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশনাল নকশা যেমনঃ লহর তোলা, পুষ্পিত লতা, শামুক পাড়, চোখ পাড় ইত্যাদি নকশা বেশি ব্যবহৃত হয়। রেশমি সুতা দ্বারা সূক্ষ্ম কাঁথা ফোঁড় ও কাস্তে ফোঁড়ের ব্যবহারও দেখা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পের নকশার স্বরূপ বিশ্লেষণ

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ করে যশোর ও খুলনা জেলার ১৯ ও ২০ শতাব্দীর সময়ে তৈরি সূচিশিল্পের নিদর্শন সম্পর্কে জানা যায়। যেখানে ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা বা অন্যান্য সূচিকর্মের রূপ বৈচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন: খুলনার ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি সূচিশিল্পের নকশার বর্ণনা দেয়া হলো।

১৯-২০ শতাব্দীতে প্রাপ্ত খুলনার সূচিকর্ম

১৯ শতাব্দীতে একটি (১৬.৫-২৫.৮) সে.মি. একটি 'দূর্জনী বা থলে কাঁথা'র মাঝবরাবর পদ্ম মোটিফ ও তাকে কেন্দ্র করে রেডিয়াল ভারসাম্যে সাদা জমিনে গেরুয়া ও কালো রঙের ভরাট, ডাল ও কাঁথা ফোঁড়ের মাধ্যমে নকশার বিন্যাস দেখা যাচ্ছে। (চিত্র: ৭৬)।[৪৬] ২০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আনুমানিক খুলনায় প্রাপ্ত (১২৭-১৯৩) সে.মি. বিশিষ্ট একটি মোটা 'নকশি কাঁথা'য় অশোক গাছের পাতাসহ ডালের নকশা দেখা যায়। যেখানে সাদা জমিনে ডাল-পাতাগুলো লাল, নীল ও সবুজ রঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাঁথার পাড়ে চিক তাগা বা চিক পাড় সেলাই দেয়া হয়েছে। (চিত্র: ৭৭)।[৪৭] ১৯ শতাব্দীতে তৈরি (২৮-১২.৭) সে.মি. একটি 'আরশিলতায়' (আয়নার আচ্ছাদন) লক্ষী দেবীর বর্ণনামূলক নকশা দেখা যায়। এখানে সাপ, পাখি, ময়ূর, খেজুর গাছ, হাতি, নৌকা, সাতটি মানুষের ফিগার দেখা যাচ্ছে। দেবী লক্ষী স্টাইলাইজড পদ্মের উপরে বসে আছে, পদ্ম ফুলের দুই ধারে দুটি হাতি আছে। নিচে বাম দিকের কর্ণারে মহিলাদের কানের দুলের নকশা দেখা যাচ্ছে। সাদা জমিনে লাল, নীল, কমলা, সবুজ রঙের সুতা দিয়ে কাঁথা ফোঁড় ও ডাল ফোঁড়ের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চোখ পাড় সেলাই দিয়ে পাড়ের নকশা করা হয়েছে। (চিত্র: ৭৮)।[৪৮] এই সূচিশিল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে প্রথাগত মোটিফ ও ফোঁড় দ্বারা কাপড়ের জমিনে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখিত তিনটি শিল্প ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর নকশা, রঙ ও সেলাইয়ের প্যাটার্ন প্রায় এক রকম। প্রকৃতি ও সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সরলীকরণ নকশায় শোভা পাচ্ছে।

বর্তমানে সূচিশিল্পের যে বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়, তা পূর্বে তেমন ছিল না। অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন ধরনের নকশি কাঁথা। কাঁথার আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে তার নামকরণ করা হতো। তাই আঠারো থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে যেসকল সূচিকলার নিদর্শন পাওয়া যায়, তার সবই নকশি কাঁথার

[৪৬] Patrick J Finn, *Quilts of India- Timeless textiles*, Niyogi Books, New Delhi- 110 020, India, 2014, page no: 80.

[৪৭] প্রাগুক্ত , পৃ: ৮৮।

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।

অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের যে যে অঞ্চল সূচিশিল্পের জন্য বিখ্যাত তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি জেলা যশোর। নিম্নে যশোর জেলার কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা

২০ শতাব্দীর শুরুতে তৈরি (১৬২-২২৩) সে.মি. আকারের একটি 'লেপ কাঁথা'র (এটি একটি উপহার স্বরূপ দেয়া কাঁথা) নকশায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষায় সেলাই করে লেখা- " আমার স্নেহের নাতনী শ্রমতী শতদল বামীনি দেবী অংশী বর্বাদিকা তোমার ঠাকুমাতা", এর ঠিক বিপরীত দিকের অপর প্রান্তে লেখা-"হস্তী যদি বল ঘরে মাহুতে কি কত্তে পারে এমন নির্বোধ হস্তী মাহুতের বশে ফেরে।" এই কাঁথাটি দুই প্রান্তযুক্ত নকশার বিন্যাসের উদাহরণ। অর্থাৎ, এখানে নকশার প্রতিসাম্যের বিষয়টি লক্ষণীয়। সাদা জমিনে লাল,নীল, হলুদ, সবুজ ও কালো রঙের মাধ্যমে সেলাই করা হয়েছে। চতুর্দিকে শাড়ির বুনট পাড় দেখা যাচ্ছে। হাতি, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, পাখি, ময়ূর, প্রজাপতি, বর,কনে, পান পাতা, ফুলেল লতা, চক্র ইত্যাদি নকশা শোভা পাচ্ছে। (চিত্র: ৭৯)।[৪৯] ১৯ শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি একটি (১১১.৮-১৮২.৯) সে.মি. 'সুজনি কাঁথা'য় জ্যামিতিক- ফুলেল নকশা দেখা যায়। চারটি বন্ধনীর মাঝে আবদ্ধ একটি রঙিন ফুল, এভাবেই সম্পূর্ন কাঁথার জমিন জ্যামিতিক ফর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক নকশার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বন্ধনীগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নকশি পাড়ের নকশা দেখা যাচ্ছে, যেমন: চোখ পাড়, মটর দানা পাড়,ধানের শীষ পাড় ইত্যাদি। সাদা জমিনে লাল,নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ, খয়েরি,কালো রঙের ব্যবহার আছে। অধিকাংশ ফুলের নকশাগুলো দুই বা তিন রঙের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। (চিত্র: ৮০)।[৫০] ২০ শতাব্দীর শুরুতে তৈরি (৭১.১২-৭৬.২) সে.মি. বিশিষ্ট একটি 'আসন কাঁথা'র নকশায় 'জীবন বৃক্ষ' মোটিফকে কেন্দ্র করে নকশা করা হয়েছে। এই কাঁথার নকশাগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যার জন্য এটি অনন্য। সাদা জমিনের উপরে লাল, কালো সুতা দিয়ে নকশা করা হয়েছে। (চিত্র: ৮১)।[৫১] এসব সূচিশিল্পের নকশায় উজ্বল ও প্রাথমিক রঙের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। যে আকারের কাঁথাই হোক না কেন প্রতিটি কাঁথার সম্পূর্ন জমিনকে ব্যবহার করেই নকশা বিন্যাস করা হয়েছে। পাড় হিসেবে কখনো শাড়ির পাড়টিই কাঁথার সাথে সমন্বয় করে লাগানো হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে নকশি পাড় সেলাইয়ের মাধ্যমে পাড় করা হয়েছে। সাধারণত পুরাতন কাপড়ের ওপর নকশা করা হতো। অধিকাংশই সাদা রঙের জমিন বিশিষ্ট। বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, মানুষ, ফুল, লতা-পাতার মোটিফ শোভা পেতো। জ্যামিতিক ফর্ম ও বর্ণনামূলক নকশার প্রচলন বেশি দেখা যায়।

---

[৪৯] Patrick J Finn, *Quilts of India-Timeless Textile*, Niyogi Books, New Delhi-110 020, India-2014, page no: 117.

[৫০] প্রাগুক্ত , পৃ: ১১০ , ১১১ ।

[৫১] প্রাগুক্ত , পৃ: ৯৩ ।

খুলনা বিভাগে বর্তমানে যেসব সূচিকর্ম প্রচলিত সেখানে ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার মোটিফ ও প্যাটার্নই বেশি দেখা যায়। তবে, বর্তমানে অধিকাংশ নকশাই ইসলামিক ভাবধারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। খুলনায় বিভিন্ন এলাকার সূচিশিল্পীদের কাছ থেকে জানা যায়, ২০০০ সালের পর থেকেই সূচিনকশার মোটিফে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং এই সময় থেকেই অধিকাংশ সূচিশিল্পে পশু–পাখির মোটিফ বা মানুষের চিত্র বিলীন হতে শুরু করে। ঐতিহ্যবাহী অর্থপূর্ণ নকশার পরিবর্তে শুধুমাত্র সজ্জামূলক নকশার প্রাধান্য পাচ্ছে। যেমন: যশোরের 'ছোঁয়া হস্তশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা' তটিনী এলিজাবেথ সাহা জানান, ২০০০ সালের পর থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে যেসব সূচিনকশার উপর বেশি কাজ হচ্ছে বা স্থানীয় গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী যে কাজগুলো হয়েছে, সেখানে অধিকাংশই ফুল, লতা–পাতার নকশা, ময়ূরের শুধুমাত্র পেখমের নকশা হয়েছে ইত্যাদি। কুষ্টিয়ার সূচিশিল্পী ও ইসলামিয়া কলেজের প্রভাষক সাদিয়া ফারজানা মহুয়া জানান, ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার মধ্যে যে মোটিফগুলো তাঁর ব্যক্তিগতভাবে অধিক পছন্দের সেগুলো বিগত চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করার সুযোগ হচ্ছে না। কারণ, এখানকার ক্রেতারা কোন ধরনের প্রাণি চিত্রের সূচিকর্ম ব্যবহারে আগ্রহী নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাতি মোটিফ পছন্দ করেন তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে হাতি মোটিফের কাজ তিনি খুব কমই করতে পারছেন।

সাতক্ষীরার একজন সূচিকর্মী রাফিয়া, তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে সূচিকাজের যে নকশাগুলো করেছেন সেখানে ১৯৯০-১৯৯২ সালের দিকে অনেক বেশি হাতি-ঘোড়া, পাখি, মানুষ, পালকি ইত্যাদি মোটিফের নকশা ফুটিয়ে তুলতেন। তবে, একইভাবে ২০০২ সালের পর থেকে বর্তমানে স্থানীয় ক্রেতাদের জন্য বেশি কাজ করছে সহজ–সরল নকশা ও ফুল–পাতার এবং জ্যামিতিক নকশার মোটিফ নিয়ে।(চিত্র: ৮২)।

তবে, খুলনায় বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কিছু ঐতিহ্যবাহী সূচীনকশার শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন: কুষ্টিয়া জেলার জুগিয়া পৌরসভার বর্তমানে ৮৩ বছর বয়স্ক জাহানারা খাতুন ১৯৬৬ সালে একটি হলুদ রঙের চিত্রা হরিণ ও সবুজ গাছ এবং ঘাস সম্বলিত নকশায় একটি দেওয়ালসজ্জা তৈরি করেন। এই নকশাটি জাহানারা খাতুন ব্যক্তিগত নকশার সংরক্ষিত বই থেকে নির্বাচন করেন। এক পরত সুতির সুতা দ্বারা ভরাট ফোঁড়ের মাধ্যমে সাদা কাপড়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

খুলনা বিভাগে সূচিশিল্পের জন্য যশোর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যশোরের সূচিনকশায় অনেক সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজ লক্ষ্য করা যায়। নকশার বিষয়বস্তু স্থানীয় জনগণের নিকট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহজ–সরল, প্রাকৃতিক উপাদান হলেও কিছু কিছু নকশি কাঁথা ও শাড়িতে ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার মোটিফও

রয়েছে। যশোরে ছোঁয়া হস্তশিল্পের সংরক্ষণে যেসব নকশা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নকশা হলো:

মুখোমুখি দাঁড়ানো পেখম তোলা দুটি ময়ূরের নকশার প্লেট দেখা যাচ্ছে আর জমিনে রয়েছে ছোট ছোট চক্রের মোটিফ। (চিত্র: ৮৩)।

এখানে বড় বড় তেলাপিয়া মাছের মোটিফ শোভা পাচ্ছে কুশান কাভারে। ছাই রঙের সুতা দ্বারা মাছের পাখনা, সাদা–কালো সুতা দ্বারা মাছের শরীর, হলুদ রঙের মাধ্যমে মাছের চোখ ও কাটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ফিরোজা রঙের সুতা দ্বারা বিন্দু ভিত্তিক নকশার মাধ্যমে মাছের আঁশকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সূক্ষ্ম রেশমি সুতা ব্যবহার করে ভরাট ও কাস্তে ফোঁড়ের মাধ্যমে মাছের নকশাকে জীবন্ত রূপ দেয়া হয়েছে। (চিত্র: ৮৪)।

এছাড়াও অন্যান্য মোটিফের মধ্যে শোভা পাচ্ছে কলকা, কুমড়ো ফুল, চাকা বা চক্র, পান পাতা, জীবনবৃক্ষ, হাতি, পেঁচা, গ্রামীণ সমাজের চাল–চিত্র প্রভৃতি।

শাড়ি ও কুশন কভারের পাড়ে শোভা পাচ্ছে, ঐতিহ্যবাহী পাড়ের নকশা, যার আরেক নাম হল 'তাগা'। যদিও এসব নকশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদের বিশেষ নামকরণ হয়েছে, যেমন–

- শঙ্খ আকৃতির বলে নাম হয়েছে 'শঙ্খ পাড়'।
- চোখের মত দেখতে বলে এই পাড়ের নাম চোখ পাড়।
- আঁকাবাঁকা রেখার সমন্বয়ে সৃষ্ট পাড়ের নকশার নাম 'এক ফোঁটা পাড়'।
- জ্যামিতিক বরফি আকৃতির নকশাকে বলা হচ্ছে 'কাইতে' পাড়।
- পান পাতার মোটিফের সাথে ডাল ফোঁড় দিয়ে আঁকাবাঁকা লতানো নকশার নাম 'লতা পাড়'।
- গোল গোল চক্রের মতো ভরাট ফোঁড় দিয়ে তৈরি কদম ফুলের মত নকশাকে বলা হচ্ছে 'কদমফুল' পাড়। (চিত্র: ৮৫)।

এই হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণে যে সূচিশিল্পগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি দেওয়ালসজ্জা আছে, যেখানে পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীনের 'নকশি কাঁথার মাঠ' আখ্যানকাব্যের কাহিনী সাদা রঙের জমিনে মানানসই রঙিন রেশমি সুতার সাহায্যে ভরাট, নকশি বা কাঁথা ফোঁড় ও ডাল ফোঁড়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে মোট ১১টি ভাগে পর্যায়ক্রমে সাজু–রূপাইয়ের উল্লেখযোগ্য মূহুর্তগুলো তুলে ধরা হয়েছে। (চিত্র: ৮৬)।

কাপড়ের জমিন হিসেবে বেশি সাদা রঙ পাওয়া যাচ্ছে, তবে নকশার বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করেও কাপড়ের জমিনের রঙ নির্বাচন করা হচ্ছে, যেমন: মাছের মোটিফের নকশায় নীল রঙের জমিন শোভা পাচ্ছে। এছাড়া লাল রঙটিও বেশ জনপ্রিয় জমিনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিছানার চাদর এবং কুশন

কভারে। সাতক্ষীরার 'মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়'- এর অধীনে নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় যে সূচিশিল্পগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানে এরকম লাল রঙের জমিনের উপর বেশ কিছু নকশা পাওয়া যায়। যেমন: লাল রঙের জমিনে হলুদ, বেগুনি, নীল, ফিরোজা ও গোলাপী রঙের সমন্বয়ে হাতির পিঠে উপবিষ্ট যোদ্ধা বা রাজকুমার এর একটি প্যার্টান তৈরি করে তা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বিশেষ ছন্দে একই সরল রেখার পাড়ের নকশার মত নকশাটি বিস্তৃত করা হয়েছে। এর মাঝে মাঝে শোভা পাচ্ছে একই রঙ দ্বারা ফুলদানিতে সজ্জিত ফুল ও লতার প্যাটার্ন। হাতির পিঠে উপবিষ্ট রাজকুমারের নকশাটি জমিনের ভিতরেও সমানুপাতে সেলাই করা হয়েছে এবং এরই সাথে শোভা পাচ্ছে ফুলের একটি নকশা। তবে, এর সাদা রঙের পাড়ে রয়েছে লাল–নীল রঙের ময়ূয়ের মোটিফ ও পদ্মের মোটিফ। ভরাট ও কাস্তে ফোঁড় দ্বারা নকশাগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (চিত্র: ৮৭)।

এই প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণে এমন একটি দেওয়ালসজ্জা রয়েছে, যেখানে গ্রামীণ বিয়ের উৎসবের চিত্রে ১৩টি মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটিফগুলো হল: বিড়াল, পাখা, খেজুর গাছ, প্রজাপতি, সূর্য, পালকি, নৌকা, মাছ, জীবনবৃক্ষ, পাখি, ঢেঁকি, কলকা ও হাতি। লাল রঙের সুতি কাপড়ের জমিনে বেহারাসহ পালকিতে বউ–এর নকশাটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য মোটিফগুলো আবর্তিত হয়েছে। (চিত্র: ৮৮)।

সাতক্ষীরার সূচিশিল্পী বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ সূচিনকশা নিয়ে কাজ করছেন ১৯৭৩ সাল থেকে। তবে, বৈবাহিক সূত্রে খুলনা বিভাগে আসার পর ১৯৯০ সাল থেকে নিয়মিত সূচিকাজ করে থাকেন। খুলনার বাগেরহাট জেলায় অবস্থানকালে ১৯৯০-১৯৯২ সালের মধ্যে কিছু সূচিনকশার শাড়ি তৈরি করেন, যেগুলো ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। অধিকাংশ শাড়িই ইন্ডিয়ান অরগেন্ডি একক রঙের জমিনের। তবে, এখানে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন উজ্জ্বল রঙের যেমন–লাল, সবুজ, হলুদ, এছাড়া গোলাপী ও হালকা ঘিয়ে রঙের জমিনেও কাজ করেছেন। শাড়িগুলোর অধিকাংশ নকশাই জামদানি মোটিফের বা জ্যামিতিক ঘরানার।

নিম্নে শাড়িগুলোর নকশার বিবরণ দেয়া হল:

প্রতিটি শাড়িই তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান কাপড় ও DMC সুতা দ্বারা। তবে কিছু কিছু শাড়িতে রেশমি বা সিল্ক সুতার ব্যবহারও দেখা যায়।

লাল শাড়ি

লাল রঙের জমিনে সবুজ, হলুদ রঙের শেডের DMC সুতা দ্বারা শাড়িটিতে কলকা মোটিফের সাথে ফুলের নকশা করা হয়েছে। ভরাট ফোঁড় ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র জমিনে আনুভূমিকভাবে কলকা ও ফুলের একটি নকশারই সমান্তরালভাবে পৌনঃপুনিক ব্যবহার করা হয়েছে। পৃথকভাবে কোনো পাড়

ও আঁচলের নকশা করা হয়নি। ফলে লাল জমিনে হলুদ-সবুজের সমাহার খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (চিত্র: ৮৯)।

হলুদ শাড়ি

বিভিন্ন ছোট ছোট জ্যামিতিক ফর্ম শাড়ির পাড়–আঁচল ও জমিনে সিমেট্রিক্যালভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হলুদ রঙের জমিনে সবুজ রঙের সিল্ক সুতা দিয়ে যশোর স্টিচের মাধ্যমে চওড়া পাড় ও আঁচলে বুটিদার নকশা করা হয়েছে। (চিত্র: ৯০)।

গোলাপি শাড়ি

হালকা গোলাপি রঙের জমিনে সাদা রেশমি সুতা দিয়ে লম্বভাবে শাড়ির পাড়, আঁচল ও জমিনে কলকার পর্যায়ক্রমিক নকশার ব্যবহার দেখা যায়। যশোর স্টিচের মাধ্যমে নকশা তৈরি হয়েছে। এখানে তিন ধরনের 'কলকি' মোটিফ দেখা যায়; এক- ছোট একক কলকা, দুই- ছোট কলকার থেকে দ্বিগুণ তারা ও কলকা এবং তিন- ছোট কলকা থেকে তিনগুণ ডাবল ফ্রেমের কলকা মোটিফ। যেহেতু হালকা গোলাপি রঙ ও শাড়ির জমিন কিছুটা স্বচ্ছ, তাই এখানে সাদা রঙের ভরাট নকশা ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। শাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শাড়ির পাড়ে সাদা সুতার কুশি-কাটার পাড় করা হয়েছে। (চিত্র: ৯১)।

হালকা ঘিয়ে শাড়ি

ঘিয়ে জমিনে ফিরোজা ও মেজেন্টা রঙের রেশমি সুতা দিয়ে পাড় ও আঁচলে জামদানি 'পুঁই ফুল' পাড়ের মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে একই সুতা দিয়ে পাড়ে কুশি-কাটার কাজ করে ও আঁচলে টার্সেল দেয়া হয়েছে। (চিত্র: ৯২)।

কালো শাড়ি

কালো জর্জেট কাপড়ের জমিনে বাদামী ও হলুদ রঙের DMC শেড সুতা দ্বারা চওড়া জামদানি নকশার পাড়–আঁচল করা হয়েছে। যশোর স্টিচের ব্যবহার রয়েছে। জর্জেট কাপড়ের জন্য সিল্ক সুতার তুলনায় সুতির সুতা বেশি উপযুক্ত কারণ এই ধরণের কাপড়ে সিল্ক সুতার পিচ্ছিল বৈশিষ্টের কারণে সংকুচিত হয়ে যায়; যা সুতি সুতার ক্ষেত্রে হয়না। (চিত্র: ৯৩)। ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের মধ্যে করেছেন ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি দেওয়ালসজ্জা যেখানে ফুলের নকশা ও বিচিত্র বর্ণের চিত্র শোভা পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য দেওয়ালসজ্জাগুলোর মধ্যে ১৯৯৬ সালে তৈরি একটি নকশায় মোট ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন ফোঁড়ের দেখা মেলে। ফোঁড়গুলো হলো:

১. চেইন ফোঁড়
২. গিট ভরাট
৩. স্যাটিন

৪. বোতাম স্টিচ

৫. মাছ কাটা

৬. ফ্রেন্স নট

৭. লেজি- ডেজি

৮. লেজি- ডেজি দিয়ে ফ্রেন্স নট

৯. সাবুদানা

১০. ডাবল চেইন

১১. ক্রস ফোঁড়

১২. হুইল স্টিচ

১৩. দুইমুখো ফ্রেন্স নট

কালো জমিনে বিমূর্ত নকশা করা হয়েছে এখানে। তবে, পাতা ও ডালের সাথে খুলনা বিভাগের প্রায় সব অঞ্চলে মাঠে-ঘাটে জন্মায় এমন একটি ঔষধি লতা; স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'যশোরে লতা', আভিধানিক নাম জার্মান লতা। এই লতার সাথে মিল পাওয়া যায় এই দেওয়ালসজ্জার নকশার মোটিফে। (চিত্র: ৯৪)। এছাড়াও ১৯৯০-১৯৯১ সালে তৈরি কালো রঙের জমিনে ফ্লোরাল মোটিফে করা আরও তিনটি দেওয়ালসজ্জা রয়েছে যেগুলো ভরাট ফোঁড়ের মাধ্যমে করা। এর মধ্যে ২টি দেওয়ালসজ্জা বিমূর্ত ঘরানার যেখানে একটি সাদা ও জলপাই রংয়ের ফুল ও লতা পাতার নকশায় পরিপূর্ণ। প্রাধান্য দেয়া হয় সাদা–ফুলের মাঝে লাল বৃত্তকে। অন্যটিতে লাল, নীল, ফিরোজা, হলুদ, গোলাপী ইত্যাদি বিচিত্র রঙের একই জাতীয় অসংখ্য ছোট–বড় ফুলের একটি ঝাড় শোভা পাচ্ছে। (চিত্র: ৯৫)।

অন্য যে দেওয়ালসজ্জাটি রয়েছে সেখানে শেডের সুতার মাধ্যমে বৈচিত্র আনা হয়েছে নকশায়। এখানে জবা ফুলের নকশা ছন্দাকারে পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। এই ধরনের সূচিনকশার স্টাইলকে বলা হয় 'Art Nouveau' যেটি ১৮০০ সালের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে করা একটি ফ্লোরাল প্যাটার্ন। যেখানে প্রকৃতিতে পাওয়া ফুল, লতা, পাতাকে বিমূর্ত ও স্টাইলাইজড ভঙ্গিতে আঁকা হয় এবং গাঢ় রঙের ব্যবহার করা হয়।[৫২] (চিত্র: ৯৬)।

১৯৯৬ সালে শিরিন শাহনেওয়াজের 'Art Nouveau' স্টাইলে করা আরও একটি দেওয়ালসজ্জা দেখা যায়। যেখানে গোলাপ ফুলের মোটিফকে রানি গোলাপী ও সাদা শেড সুতার মাধ্যমে ছন্দাকারে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। (চিত্র: ৯৭)।

[৫২] https://www.luigi-bevilacqua.com/en/flowers-art-nouveau/

এই দেওয়ালসজ্জাগুলোতে DMC বা চাইনিজ লাচ্ছি সুতা ব্যবহার করা হয়েছে। কাপড় হিসেবে সুতি পপলিন ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়া বেগম শিরিন সাদা চটের উপর কিছু কাজ করেছেন। যেমন: ১৯৯৬ সালে পাইকগাছা থাকাকালীন অবস্থায় ২টি দেওয়ালসজ্জা এবং একটি কার্পেট ও কয়েকটি জায়নামাজ তৈরি করেন। একটি দেওয়ালসজ্জায় ক্রিসমাস ট্রিসহ একটি কাঠের ঘরের চিত্র ক্রস ফোঁড় দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেখানে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার করে, এক জাতীয় রঙ দ্বারা শেড সৃষ্টি করতে দেখা যায়। (চিত্র: ৯৮)।

অন্য আর একটি চটের ওয়ালম্যাটে লাল, হলুদ, কমলা রঙের ফুলের গাছে নীল ও সাদা রঙের চারটি দোয়েল পাখি ক্রস ফোঁড় দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ বিশেষ অংশ সাদা ও কালো রঙ দ্বারা দেখানো হয়েছে। (চিত্র: ৯৯)।

চটের কার্পেটটি (১৫২-১২১) সে.মি. বিশিষ্ট সম্পূর্ণ জমিনে নকশা করা। এখানে বেশিরভাগ অংশ রেখা ভিত্তিক নকশা করা। মাঝের অংশে জ্যামিতিক- ফ্লোরাল নকশা করা। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, কালো রঙের উলের সুতা দ্বারা নকশাগুলো বিশেষ পর্যায়ক্রমিক ছন্দে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (চিত্র: ১০০)।

বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ অধিকাংশ কাজই করেছেন তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নকশা সংগ্রহ করে। কোথাও কোন নকশা দেখে ভাল লাগলে, সেই নকশা বা চিত্রকে নিজের ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করতেন এবং সেভাবেই তৈরি করার চেষ্টা করতেন। সাধারণত, এই ধরনের সূচিকর্মের মাধ্যমে তিনি তাঁর অবসর সময়কে আনন্দময় করে তুলতেন এবং শখের খোরাক জোগাতেন।

অর্থাৎ, আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খুলনা বিভাগের যে সূচিশিল্পগুলো হচ্ছে বা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত হয়ে আসছে তার নকশার রূপ বৈচিত্র ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশা যেমন নকশি কাঁথার নকশার ধরনকে যেমন অনুসরণ করছে, তেমনি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সূচিশিল্পীরা নিজেদের পছন্দমত চিত্র ও নকশা ফুটিয়ে তুলছেন। তবে, বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে কাঁথা ফোঁড়, কাস্তে ফোঁড়, ভরাট ফোঁড় এবং যশোর স্টিচ। শাড়ি ও নকশি চাদর বা কাঁথাতে থাকছে একাধিক পাড়ের নকশার প্রাধান্য। তবে, তুলনামূলকভাবে যশোরের সূচিশিল্পের নকশায় বৈচিত্র বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং রেশমি বা সিল্ক সুতার সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজ দেখা যায়। অন্যদিকে খুলনা জেলার সূচিশিল্পে তাঁতের সুতা বা সুতির সুতার প্রচলন বেশি, ফলে সূচিনকশার জমিনগুলো ভারি ও স্ফীত। যে কারণে খুলনার সূচিশিল্পকে তুলনামূলকভাবে কম নিখুঁত বলা যায়। ব্যবসায়ের ভিত্তিতে যারা সূচিকর্ম করছেন, তাঁরা ক্রেতাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। বর্তমানে তথ্য–প্রযুক্তির যুগে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিধি–নিষেধ সম্পর্কে

পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। তাই, জীব–জন্তুর নকশা সম্বলিত সূচিশিল্প বর্তমানে ব্যবহারে আগ্রহী নন।

বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী লোকজ মোটিফ থেকে সহজ–সরল ফ্লোরাল নকশার প্রচলন বেশি দেখা যায়। অধিক হারে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করার ফলে কাজের মধ্যে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে নকশা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কম পরিশ্রমে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায়, এমন ধরনের নকশা বা চিত্র ব্যবহৃত হয়। তাই, আধুনিক সূচিনকশায় যেমন নতুন নতুন ও ভিন্নধর্মী উপস্থাপন দেখা যায়, তেমনিভাবে ঐতিহ্যবাহী নকশার প্রচলন প্রায় কমে এসেছে। সৌখিন ব্যক্তিরা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী নকশায় করা সূচিকাজ ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় স্থান দেন। ফলে, লোকমোটিফযুক্ত সূক্ষ্ম কাজের সূচিশিল্পের মূল্যও সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে উচ্চমানসম্পন্ন সূচিশিল্পের থেকে মধ্যমানের সূচিশিল্পের প্রচলন বেশি দেখা যায়। শখের বশে যারা সূচিশিল্প নিয়ে কাজ করছেন, তারা নিজ নিজ রুচিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং নকশায় নতুনত্ব আনার থেকে অনুকরণমূলক শিল্প তৈরিতে বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। তবে, ১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ঘরে ঘরে সৌখিন সূচিশিল্পের যে প্রচলন ছিল, তা বর্তমানে অনেকাংশেই কমে গেছে। বিশেষ করে ২০০০ সালের পর থেকে সূচিশিল্পের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র বেড়েছে এবং নারীদের সমাজে চাকরির ক্ষেত্র বাড়ার সাথে সাথে অবসর সময় কমেছে। ফলে, বর্তমানে গৃহকোণে বসে সূচিনকশা করার মানুষের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কমে আসছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক উন্নয়নে খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পীদের অবদান

বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষম ও দক্ষ জনগোষ্ঠীর। বেকার সমস্যার সমাধান যত বেশি করা যাবে দেশ তথা সমাজের তত বেশি উন্নতি সাধন হবে। সূচিশিল্প অতীতে মানুষ গার্হস্থ্য জীবনের নানা প্রয়োজন মিটানোর জন্য তৈরি করতো, যেখানে অবসর সময়ে মনের নান্দনিক আবেগের উপস্থাপন করে তাকে শিল্পের মর্যাদা দিত। তবে, বর্তমানে সূচিশিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। ঘরে ঘরে শখের বশে যেমন সূচিকাজের প্রচলন রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও এখন সূচিশিল্পের একটি বিশেষ চাহিদা ও বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে সূচিশিল্প নিয়ে ব্যবসায়িকভাবে কাজ করছেন এমন ছোট–বড় অনেক উদ্যোক্তা রয়েছেন। যারা এই কাজ নিয়ে যেমন নিজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন ঠিক একই সাথে হতদরিদ্র কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ হলো নারী; যারা এই কাজের সাথে বেশি সম্পৃক্ত। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও শিক্ষানবীশ তরুণ ছাত্রীরা সূচিকাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করছে। বাড়তি আয়ের উৎস তৈরি করে নিজেকে স্বাবলম্বী করছে ও পরিবারকে সহযোগিতা করছে।

সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সূচিশিল্পের উন্নয়নে এবং সূচিশিল্পকে পুঁজি করে যেন স্বাবলম্বী হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেকেই নিজেদেরকে দক্ষ করে সূচিশিল্প নিয়ে ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেহেতু সূচিশিল্পে সূচনালগ্ন থেকে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বেশি, তাই এই শিল্পের অধিকাংশ উদ্যোক্তাই নারী। এখানেও যারা কর্মজীবী বা শ্রমিক হিসেবে আছেন তারাও অধিকাংশ নারী। তবে, পুরুষরাও রয়েছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম।

খুলনা জেলা সদরের 'ময়লাপোতা' এলাকার মহুয়া আক্তার তামান্না একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যিনি খুলনা বি.এল. কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করে বিভিন্ন সরকারি–বেসকারি প্রতিষ্ঠান থেকে হাতের কাজের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে মাত্র ৫০০০ টাকা মূলধন নিয়ে 'সুঁই–ফোঁড়' বুটিকস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন ২০১৩ সালে। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে ২৫ জন কর্মী। খুলনার জেলা সদর, দৌলতপুর, দীঘলিয়া ইত্যাদি জায়গায় ১৫টি ফিল্ড রয়েছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনা ও শৈল্পিক চিন্তা থেকে সূচিশিল্পের নকশা এবং কাজ পরিচালনা করেন। প্রথম দিকে তাঁর পরিবারের সহযোগিতা এই সূচিশিল্পের কাজ

এগিয়ে নিতে অনেক সাহায্য করেছে। মূলত নিজের ও পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি এই পেশায় আগ্রহী হন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য দেশে–বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হচ্ছে। অনলাইন শপ এবং বিভিন্ন ফ্যাশন–হাউজেও এখানকার পণ্য বিক্রি হচ্ছে। দেশের বাইরে বিশেষ করে সৌদি–আরব ও মালয়েশিয়াতে তাঁর প্রবাসী আত্মীয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ পাচ্ছেন।

সূচিশিল্পের উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে থ্রি-পিস, ওয়ান পিস, ওয়ালম্যাট, কাঁথা ইত্যাদি। ওয়ান পিসের দাম সাধারণত ৫০০-১৫০০ টাকা এবং থ্রি–পিসের দাম সাধারণত ১৫০০-৫০০০ টাকা। প্রধানত প্রোডাকশনের উপরে কর্মীদের মজুরি নির্ধারিত হয়। সাধারণত পণ্য তৈরির সর্বনিম্ন সময় এক সপ্তাহ। (চিত্র: ১০১)।

মহুয়া আক্তার তাঁর সবগুলো কাজেই সপ্তাহে এক বা দুই দিন নিজে সরেজমিনে গিয়ে কাজ প্রত্যক্ষ করেন। সুবিধাবঞ্চিত নারী বা দরিদ্র ঘরের স্কুল–কলেজগামী মেয়েরা তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে কাজ করে থাকে। এরকম কয়েকজন হলো সালমা খাতুন, মিতু আক্তার, সাথী আক্তার। (চিত্র: ১০২)। যাঁরা দৈনিক ১০০ টাকা মজুরিতে কাজ করছেন এবং নিরাপদে ও নির্ঝঞ্ঝাটভাবে সূচিকাজের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করছে। সূচিকাজের পাশাপাশি তিনি এখানে ব্লক–বাটিক ও দর্জির কাজেরও ব্যবস্থা করেছেন। ইন্ডিয়া ও যশোর থেকে সূচিকাজের উপাদান বিশেষ করে সুতা সংগ্রহ করেন। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগ ও সৃজনশীল চেতনাকে পুঁজি করে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তবে, নিজেকে এই কাজের উপযুক্ত করেছেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। ২০১২ সালে হোপ পলিটেকনিক খুলনা থেকে ৬ মাসের ফ্যাশন ডিজাইনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০১৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা থেকে সুঁই–সুতার উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। 'উদ্দমী সংস্থা'-শান্তি ধামের মোড়, এখান থেকে ব্লক-বাটিকের ট্রেনিং নেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি গ্রীণ নারী কল্যাণ ফাউন্ডেশনে (খুলনা) বুটিক ও ফ্যাশন ট্রেইনার হিসেবে কাজ করছেন।

খুলনা জেলার 'খান জাহান আলী রোড' এলাকায় আরও একজন সূচিশিল্পী শাহানা পারভীন বেবি জানান ২০০০ সালে সূচিশিল্পের কাজ শুরু করেন তিনি। সম্পূর্ণ একক পরিচালনায় ৪০ জন কর্মী নিয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা। যুব উন্নয়ন থেকে ব্লক–বাটিক ও সুচিকাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। সূচিশিল্পের মধ্যে তিনি তৈরি করছেন দেশি পোশাক (পাঞ্জাবী, থ্রি–পিস, টু-পিস) নকশী কাঁথা, নকশি চাঁদর ইত্যাদি। এক একটি নকশি কাঁথা তৈরিতে সর্বোচ্চ সময় লাগে এক বছর। তবে, কাজের উপর নির্ভর করে, স্বল্প কাজের যেমন: থ্রি–পিস, হালকা কাজের চাঁদর, পাঞ্জাবী ইত্যাদি

তৈরিতে ১৫-২০ দিন সময় লাগে। ক্রেতার চাহিদা ও চলমান ফ্যাশনের সাথে মিল রেখে সূচিশিল্পের নকশা নির্বাচন করেন। (চিত্র: ১০৩)।

প্রধান নকশাকার হিসেবে কাজ করছেন তাঁর মেয়ে খুলনা মেডিকেলের ছাত্রী। পরিবারের সহযোগিতায় শাহানা পারভীন সূচিশিল্পের মাধ্যমে নিজের আর্থ–সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার। এ পর্যন্ত ১৫-১৬টি হস্তশিল্প জেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন: ২০১৭ ও ২০১৮ সালের বিসিক কর্তৃক আয়োজিত খুলনায় মহান বিজয় দিবস মেলা (ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প পণ্য প্রদর্শন ও বিপণন)– তে অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা পেয়েছেন। ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, খুলনা'- কর্তৃক আয়োজিত ঘরোয়া হস্তশিল্প মেলায় অংশ নিয়েছেন। জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন মেলা ২০১৯-এ সম্মানসূচক পুরস্কার (তৃতীয়) অর্জন করেন। এই সম্মানসমূহ শুধুমাত্র তাঁর কাজের স্বীকৃতিই নয় বরং ভবিষ্যতে সূচিশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা, সমাজে একজন প্রগতিশীল ও আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার উৎস। (চিত্র: ১০৪)।

যশোর জেলার সূচিশিল্পের সুনাম সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। এই জেলার প্রায় সব অঞ্চলেই সূচিকাজের ছোট–বড় ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন: যশোর চৌগাছা পৌরসভার কারিগর পাড়া, বাকপাড়া, চাঁদপুর, মনমতপুর, মালোপাড়া, হুদাপাড়া, পাচনামনা, ইছাপুর, বেলেমাঠ, তারনিবাস, কংসারিপুরসহ প্রায় ১১ গ্রামের ৯০০ এর অধিক মহিলা নকশি কাঁথা, চাঁদর, শাড়ি, দেওয়ালসজ্জা, ওড়না ইত্যাদি তৈরি করে বাড়তি আয় করছেন। অর্থাভাবে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কাজের মাধ্যমে আবারও লেখাপড়া শুরু করতে পারছে, বিধবা, দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত নারীরা এসব কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারছে। কারিকর পাড়ার 'বন্ধুহস্ত শিল্প' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে অসহায় ও অস্বচ্ছল নারীরা সূচিশিল্পের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেছে। রামভদ্রপুর গ্রামের রোকেয়া বেগমের কাছ থেকে ৫০ জন মহিলা প্রতিদিন কাঁথা, শাড়ি ও বিছানার চাদরের কাপড় নিয়ে কাজ করছেন। যেগুলো ৭ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে জমা দিয়ে পারিশ্রমিক নিয়ে যায়। মজুরি পাচ্ছে ৫০০-৭০০ টাকা। একটি কাঁথার কাজ শেষ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগছে। মজুরি পাচ্ছে ৯০০ থেকে ১০০০ বা ২০০০ টাকা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান যেমন: অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বরিশাল, সিলেট, খুলনা ইত্যাদি অঞ্চলে বিক্রি হয়ে থাকে। দেশের বাইরেও যাচ্ছে এসব পণ্য। এখানকার নকশি কাঁথার বিক্রয়মূল্য ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার

টাকা, শাড়ির বিক্রয়মূল্য ৮ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা, শাড়িতে সুঁই–সুতার নকশায় সুতার পাশাপাশি জরি চুমকির কাজও হয়ে থাকে।[৫৩] (চিত্র: ১০৫)।

যশোরের এরকম আরও একটি গ্রাম হল বাঘারপাড়া থানার 'পান্থপাড়া'। ছায়া ঢাকা গ্রামে প্রবেশ করতে চোখে পড়ে আম গাছের ছায়ায় পাটি বিছিয়ে গ্রামের গৃহবধুরা কাঁথা সেলাই করছে। শীত–গ্রীষ্ম প্রায় সব সময়ই এই দৃশ্য চোখে পড়ে। এই গ্রামের গৃহবধূ, কিশোরী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এমন ১০০ জন নারী নকশি কাঁথা সেলাই এর কাজের সাথে সংযুক্ত। নানা রকম বাহারী নকশার কাঁথা সেলাই এখানকার মূল সূচিশিল্প। বিশেষ করে আলপনা নকশা ও প্রথাগত নকশা- যেমন: কুলা, পদ্ম, লহরতোলা ইত্যাদি নকশা বেশি করে থাকে।

যশোরের ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশা নিয়ে কাজ করছেন 'তটিনী এলিজাবেথ সাহা'। যশোর সদরের শেখহাটি এলাকায় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ছোঁয়া হস্তশিল্প'। যশোরের একটি বেসরকারি সংগঠন 'বাঁচতে শেখা'- নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ১৯৯১-২০০৩ সাল পর্যন্ত সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে হস্তশিল্প বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে যাত্রা শুরু করেন নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ইটালিয়ান একজন নাগরিক প্রফেসর তারশিত এর ভালো সম্পর্ক থাকায় এখানে তৈরি সূচিশিল্প নিয়ে তিনি দেশের বাইরেও প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। ইটালিতেও বেশ ভালো একটি চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে দেওয়ালসজ্জা ও নকশি চাদরের জন্য ইটালিয়ান নাগরিক বাৎসরিক ৩০,০০০ টাকার সূচিকাজের অর্ডার দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের ৫টি ফিল্ড রয়েছে, মূল অফিসে ৫ জন কর্মী রয়েছে এবং প্রতিটি ফিল্ডে ১০০ জন সূচিকর্মী কাজ করছে। ১০০ জনের মধ্যে ৪ জন করে দলনেতা থাকে। যাদেরকে নকশা ও ফোঁড় বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং অন্যান্য কর্মীদেরকে এই ৪ জন দলনেতা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন। (চিত্র: ১০৬)। সাধারণত সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থান ও সূচিশিল্পের প্রতি ভালবাসা থেকে তিনি এই শিল্প নিয়ে এগিয়ে আসেন উদ্যোক্তা হিসেবে। মূল নকশাকার হিসেবে কাজ করছেন তাঁর ছোট বোন করুণা সাহা। (চিত্র: ১০৭)। যিনি ১৬´´/১৬´´ কাগজে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং এর মাধ্যমে ট্রেসিং পেপারে নকশা এঁকে নেন। এরপর কাগজগুলো নকশা বরাবর ছোট ছোট ছিদ্র করে কেরোসিন ও এলামাটির (লাল এবং কালো) সাহায্যে কাপড়ের উপর ছাপ দিয়ে নকশা এঁকে নেন। সাধারণত রঙিন ও গাড়ো রঙের কাপড়ে লাল এলামাটির ব্যবহার করা হয়। কালো রঙের জমিনে মাটির পরিবর্তে বোরিক পাউডার ব্যবহার করা হয়। নকশার জন্য উন্নতমানের ট্রেসিং পেপার ইন্ডিয়া থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। (চিত্র:১০৮)।

[৫৩] আলোকচিত্র, দৈনিক *নয়া দিগন্ত*, ৬ নভেম্বর ২০১৭, সংগৃহীত।

সূচিশিল্পের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন সিল্ক কাপড় ও সিল্ক সুতা। এছাড়াও সার্টিন কাপড়, ধুপিয়ান সিল্ক, মসলিন ইত্যাদি কাপড় ব্যবহার করছেন। এগুলো যশোরের স্থানীয় বাজারেই পাওয়া যায়। মজুরি নির্ধারিত হয় কাজের উপর ভিত্তি করে, এক একটি শাড়িতে প্রায় ২-আড়াই মাস সময় লাগে। ৪-৫ জন মিলে একটি শাড়ি তৈরি করেন, যার বাজার মূল্য ধরা হয় ৮,৫০০/- থেকে ১৩,৫০০/- পর্যন্ত। নকশি কাঁথা তৈরিতে ৯-৫ মাস, এছাড়াও কামিজ, দেওয়ালসজ্জা, পার্সব্যাগ ইত্যাদি সূচিশিল্পও রয়েছে। (চিত্রঃ ১০৯)। দেওয়ালসজ্জার মধ্যে এখন পর্যন্ত সেরা কাজ হচ্ছে সাজু–রূপাই এর মূল কাহিনী যা নকশি ফোঁড়ের মাধ্যমে সিল্ক কাপড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। পাড়ে ব্যবহার করেছে ধুপিয়ান সিল্ক কাপড়। এটি তৈরি করেছেন ২০১৩-২০১৭ সালের মধ্যে। মূল্য রেখেছেন ২৫,০০০/-। (চিত্রঃ ১১০)। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে করা এমনই একটি দেওয়ালসজ্জা বঙ্গভবনে স্থান পেয়েছে ২০১৭-২০১৮ সালে।

নিরাপদ পরিবেশে মহিলারা তাদের শিশু সন্তানসহ এখানে নির্বিঘ্নে কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন দেশ থেকেও সূচিশিল্প নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তাঁরা তটিনী সাহার কাছে আসছেন যশোরের সূচিশিল্প সম্পর্কে তথা বাংলাদেশের সূচিশিল্প সম্পর্কে জানতে। তিনি তাঁর যশোর শেখহাটিতে অবস্থিত নিজ বাড়ির একাংশে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। (চিত্রঃ ১১১)। ভবিষ্যতে এখানে একটি বিশ্বমানের সূচিশিল্পের গ্যালারি দেয়ার ইচ্ছা রয়েছে এবং সূচিশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী নকশা নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং নকশাকেন্দ্র তৈরির আগ্রহ রয়েছে।

যশোর সদরে মুজিব সড়ক রোডে অবস্থিত 'সৃষ্টি হস্তশিল্প এন্ড বুটিক', রুবিনা আক্তার আইভি তা প্রতিষ্ঠা করেন ২০০০ সালে। প্রথমে পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পণ্যসামগ্রী তৈরি করলেও পরবর্তীতে তা বড় আকারে অর্থাৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য তৈরি করা শুরু করেন। সূচিশিল্পের মধ্যে রয়েছে দেওয়ালসজ্জা, নকশি কাঁথা, ওড়না, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। আত্মনির্ভরশীলতা ও পারিবারিক স্বচ্ছলতার জন্য তিনি এই ব্যবসা শুরু করেন।

সাতক্ষীরা জেলার লাবসা, ঝাউতলা গ্রাম নিবাসী রাফিয়া একজন সূচিকর্মী। ১৯৮৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হয়ে সূচিশিল্পের কাজ করে আসছেন। তাঁর কাজের শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালের মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান রিফাত আমিন এবং পরবর্তীতে রওশন আরা, ১৯৯২-২০১০ সালের চেয়ারম্যান সাফিয়া করিম এদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা রাফিয়াকে সূচিশিল্পের নকশা এনে দিতেন এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি এসব সূচিশিল্পের কাজ করতেন। অধিকাংশ কাজ করেছেন সফুরা সিল্কের উপর শাড়ি, যা ২-১০ দিন সময় লাগত মজুরি হিসেবে শাড়ি প্রতি তখন আয় করতেন ২৭০০/- টাকা, ৮০০০-৫০০০/- টাকা মজুরি পান নকশি

কাঁথার জন্য। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যক্তির দেয়া কাজ তিনি পাচ্ছেন ও ক্রেতার চাহিদানুসারে ডিজাইনের উপর কাজ করছেন। এভাবে কাজ করার সুবাদে তাঁর সংগ্রহে প্রায় ১০০০ এর মত ডিজাইন বা সূচিশিল্পের নকশার প্লেট রয়েছে। (চিত্র: ১১২)। অন্যান্য সূচিশিল্পের মধ্যে ঈদ–উল–ফিত্‌র ও ঈদ-উল-আযহার সময়ে পাঞ্জাবীর অর্ডার তিনি বেশি পান, এমনও হয় যে ৩০ দিনে ৩৪টি পাঞ্জাবীতে সূচিনকশার কাজ করতে হয়েছে। এছাড়ও দস্তরখান, কুশান কাভার, রুমাল ইত্যাদির উপর সূচি নকশার কাজ করে থাকেন। সেখানে ২-১০ দিন সময় লাগে। এপ্লিকের বিছানার চাদরের কাজ নিয়মিত করেন। (চিত্র: ১১৩)। এভাবে বিভিন্ন স্থান, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে তিনি কাজের সুযোগ পেয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আড়ং এর হয়েও বেশ কিছু কাজ তিনি করেছেন। তবে, প্রয়োজনের তুলনায় পারিশ্রমিক কম বলে দাবী করেন। স্বামী ও তিন ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁর নিম্ন আয়ের পরিবার। সূচিশিল্পের কাজ করে যা উপার্জন করেন, তা সবই পরিবার ও সন্তানদের জন্য খরচ করেন। এত বছরের কাজের অভিজ্ঞতায় তিনি বলেন, বর্তমানে সূচিশিল্পের উপাদান যেমন: কাপড় ও সুতার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে মান আগের থেকে অনেকটাই কমে গেছে। এখনও ভালো মানের সুতা ও কাপড়ের জন্য ঢাকার বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। এত বছর ধরে কাজ করার পরও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন খুব বেশি না ঘটলেও তাঁর নিজস্ব একটি পরিচিতি গড়ে উঠেছে। অভিজ্ঞ সূচিশিল্পী হিসেবে এলাকায় বিশেষ কদর রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করলেও আত্মীয়–স্বজনের উৎসব আয়োজনে তাঁর নিজ হাতে তৈরি নকশি কাঁথা বা চাদর উপহার দিয়ে পরোক্ষভাবেও অর্থোপাজর্নে সূচিশিল্প ভূমিকা রাখছে। (চিত্র:১১৪)। ভবিষ্যতে নিজস্ব একটি সূচিশিল্পের 'শো–রুম' ও 'অনলাইন শপ' দেয়ার ইচ্ছে রয়েছে।

বাগেরহাটের দিবা ইসলাম একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, থাকছেন সাতক্ষীরা জেলার সুলতানপুর এলাকায়। সূচিশিল্প ও ব্লক–বাটিকের পণ্য নিয়ে কাজ করছেন পাঁচ বছর যাবৎ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছেন। বাগেরহাট মহিলা সংস্থা থেকে ৩ মাসের নকশি কাঁথার উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, দেবহাটা, সাতক্ষীরা থেকেও ৩ মাসের হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এছাড়াও সাতক্ষীরা নারিকেলতলা মহিলা সংস্থা শাখা থেকে শো–পিস তৈরির পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ নেবার সময়ই পরিচয় হয় কিছু মানুষের সাথে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে শুরু করেন সূচিশিল্প ও ব্লক–বাটিকের কাজ। কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা (মেয়ে) দিন প্রতি ৪ ঘন্টা ১০০ টাকা বিনিময়ে কাজ করেন দিবা ইসলামের প্রতিষ্ঠানে। সাধারণত দিবা তাঁর নিজস্ব ডিজাইনকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, কারণ তিনি চান তাঁর কাজে স্বকীয়তা বজায় রাখতে। আলপনা ও মিশরীয় নকশার প্রভাব তার কাজে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

অর্ডার অনুযায়ী বা নিজস্ব ডিজাইনে কাজ করে রাখা হয়। সূচি নকশায় উল সুতা ও রিবনের ব্যবহারও তিনি করে থাকেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডিশনাল নকশার ধারণা নিয়েও কাজ করেন। ভবিষ্যতে তিনি তাঁর এই ঘরোয়া পর্যায়ের কাজকে বৃহৎ আকারে গড়তে চান এবং ব্র্যান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবেন বলে আশা রাখেন। ভবিষ্যতে ই-কর্মাসের উপর কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। এ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প) থেকে এক মাসের একটি কোর্স করেছেন।

খুলনা বিভাগে সূচিকর্মকে পুঁজি করে আর্থিক স্বচ্ছলতা তৈরিতে সাধারণ মানুষকে সূচিশিল্পে দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মহিলাদেরকে প্রতিদিন ১০০ টাকা ও মাসে ২০০০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে সূচিনকশার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। খুলনা বিভাগের ৭৫টি কেন্দ্রে ১০টি ট্রেডে এই কাজ হচ্ছে। ২০১২ সালে খুলনায় প্রথম এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ২০১৭ সালের মার্চে সাতক্ষীরা শাখায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এখানে এই প্রকল্পের ট্রেড প্রশিক্ষক অফিস প্রধান হিসেবে আছেন মর্জিনা রহমান। বর্তমানে সাতক্ষীরা সদরে এই প্রকল্পের ১০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। প্রতি ব্যাচে ৫০ জন সদস্য থাকে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করেন। ১৮-৪০ বছর বয়সী মহিলারা বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ও সর্বনিম্ন অষ্টম এবং সর্বোচ্চ মাস্টার্স পাশ মহিলারা এখানে সদস্য হবার সুযোগ পায়। সকাল ৯:৩০-১২:৩০ এবং দুপুর ১:৩০-৪:৩০ এই দুই শিফ্টে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (চিত্র: ১১৫)। প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ও উৎপাদিত সূচিশিল্পে সকল উপাদান ও উপকরণ প্রতিষ্ঠান থেকেই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিভিন্ন নকশি ফোঁড় সম্পর্কে প্রথমে শিক্ষা দেয়া হয়। (চিত্র: ১১৬)। তারপর সাধারণত নকশিকাঁথা, ওয়ান পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, জামা, কুশান কাভার, ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য তৈরি করা হয়। (চিত্র: ১১৭)। মর্জিনা রহমান অত্যন্ত যত্ন ও তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রশিক্ষণ কাজ পরিচালনা করে থাকেন। অধিকাংশ উপাদান ও উপকরণ খুলনা সদর থেকে সংগ্রহ করেন। নকশি কাঁথার জন্য কাপড় সংগ্রহ করেন ঢাকার ইসলামপুরের কাপড়ের দোকান থেকে। পোশাকের জন্য ব্যবহার করেন ব্যাক্সিভয়েল কাপড়। অভিজ্ঞতার আলোকে যুগপোযোগী নকশা দ্বারা এসব সূচিশিল্প তৈরি করা হয়। (চিত্র: ১১৮)।

মর্জিনা রহমান খুলনা বি.এল. কলেজ থেকে সোস্যাল সাইন্সে এম.এস. পাশ করেন। বর্তমানে ট্রেড প্রশিক্ষক ও অফিস প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি তুরস্কে হস্তশিল্পের উপর ১০ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

তার এই প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সূচিকাজে দক্ষ হতে পারছে। তেমনিভাবে তারা কিছু নগদ অর্থ আয় করছে এর মাধ্যমে। ফলে এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষের প্রচুর সাড়া পড়েছে। স্বল্প সময়ে এবং বিনা খরচে সূচিকাজে দক্ষতা অর্জন করে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এখানকার নারী সমাজ।

ঋ-শিল্পী (আন্তর্জাতিক সংস্থা)

ঋ-শিল্পী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। সাতক্ষীরা জেলার গোপীনাথপুর, বিনেরপোতা গ্রামে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছে। (চিত্র: ১১৯)।

ঋ–শিল্পীর ইতিহাস: ১৯৭৫ সালে এক ইটালিয়ান দম্পতি ভিনসেনজো ফেলকোন এনজো এবং গ্রেজিয়েলা মিলানো লরা সাতক্ষীরা জেলার ঋষি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে আসেন খ্রিষ্টান মিশনারিজ থেকে দাতব্য সংস্থার হয়ে। (চিত্র: ১২০)। কিন্তু তারা এই সমাজের সামাজিক অসংগতি ও অস্বচ্ছলতা দেখে অনুভব করেন যে এই সব অসহায় মানুষদের প্রয়োজন কাজ। তাই দাতব্য অর্থায়ন থেকে সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন। যার মাধ্যমে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ় হতে পারবে। সেখান থেকে এই দুই ইটালিয়ান নাগরিকের এই প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু হল; নাম দিলেন 'ঋ-শিল্পী'। ঋ–ঋষি থেকে এসেছে যার অর্থ 'অচ্ছুত' এবং শিল্পী এর আভিধানিক অর্থ হল নিম্নবিত্ত সমাজের অতি সাধারণ মানুষের শিল্পী হয়ে সমাজের উন্নতি সাধনে অবদান রাখা।

হস্তশিল্প শাখা: উন্নয়নমূলক যে শাখাগুলো রয়েছে তার মধ্যে হস্তশিল্প বিভাগ একটি। এই বিভাগে চামড়া, এমব্রয়ডারি বা সূচিশিল্প, পাট, তাল পাতা, গমের খড়, কাঠ, জুতা এবং জরি-চুমকির শিল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে। প্রায় ৫০০ কর্মী এখানে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছে। (চিত্র: ১২১)।

সূচিশিল্পের মধ্যে যে কাজগুলো হচ্ছে তা স্থানীয় বাজার থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াতে রপ্তানী হচ্ছে। উচ্চমান সম্পন্ন সূচিশিল্প সৃষ্টিতে ঋশিল্পী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার সাথে সাথে ইউরোপিয়ান নকশাও এই প্রতিষ্ঠানের সূচিশিল্পে স্থান পায়। (চিত্র: ১২২)। বিভিন্ন আকারের চামড়ার ব্যাগ ও কাপড়ের ব্যাগে সূচিনকশার কাজ লক্ষণীয়। (চিত্র: ১২৩)। এছাড়াও নকশিকাঁথা ও কুশন কাভারে সূক্ষ্ম কাজের সূচিশিল্প দেখা যায়।

কুশান কাভারগুলো ১২০০-২০০০ টাকার মধ্যে বিক্রি হয়। ব্যাগ ১০০-৩০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। সিল্ক, সুতি, জুট ইত্যাদি মাধ্যমে সূচিকাজ করা হয়। যা সিল্ক সুতার পাশাপাশি, জরি–চুমকির মাধ্যমেও সূচিনকশার কাজ দেখা যায়। (চিত্র: ১২৪)।

এই প্রতিষ্ঠানটি সাতক্ষীরার বিশেষ করে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীদের মধ্যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কমংসংস্থানের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধন করে চলেছে নিরলসভাবে।

বাঁচতে শেখা (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

এটি একটি বেসরকারি সংস্থা। যশোর জেলার মহিলাদেরকে হস্তশিল্প, কৃষি, হাঁস–মুরগী পালন, গবাদি পশু পালন, মৌমাছি পালন ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রায় ৪০০ গ্রামের ২০,০০০ মহিলাকে এই সংগঠনটি সাহায্য করেছে।

ইতিহাস: ১৯৮১ সালে এঞ্জেলা গোমেজ সমাজ কল্যাণ অফিস থেকে নিবন্ধন নিয়ে যশোরের পুরাতন কসবা এলাকায় অস্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হস্তশিল্পের কাজের মানোন্নয়নের জন্য কাশিমপুর, পাগলদহ, নূরপুর, খোলাডাঙায় শাখা স্থাপন করেন। ১৯৮৬ সালে আরবপুর এলাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। গ্রামের শতাধিক মহিলাকে এই কাজের সম্পৃক্ত করেন তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। ১৯৯২ সালে নরওয়ে এ্যাম্বাসীর আর্থিক সহায়তায় এর স্থায়ী ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৪০০ নারী বিভিন্ন শাখায় কাজ করছে।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পুরষ্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। হস্তশিল্পে অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন হস্তশিল্পে জাতীয়ভাবে স্বর্ণপদক (১৯৮২), (১৯৮৫), (১৯৮৬), (১৯৮৮), হস্তশিল্পে রৌপ্য পদক (১৯৮৯)। হস্তশিল্পের মধ্যে অধিকাংশ কাজ হচ্ছে সূচিশিল্পের তা হলো– নকশি কাঁথা, বিছানার চাদর, শাল, পোশাক, ব্যাগ ইত্যাদি।[৫৪]

ওয়েভ ফাউন্ডেশন

১৯৯০ সালের ২৪ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শণাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ৫টি বিভাগ ২৪টি জেলার ৩টি ডমেন এর অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডমেনগুলো হল:

ক. স্থায়িত্বশীল জীবিকায়ন

খ. সুশাসন ও অধিকার

গ. সামাজিক উন্নয়ন ও জলবায়ু খাত সহিষ্ণুতা

এ প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯ সালের সূচিশিল্পের কার্যক্রম শুরু করে এলাকার হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ও তাদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে। এই সূচিশিল্পের কার্যক্রমে প্রায়

[৫৪] এঞ্জেলা গোমেজ, https://www.thedailystar.net/supplements/star-lifetime-awardees-2016/dr-angela-gomes-212809

দুইশত জন কর্মী নিযুক্ত। কর্মীরা মূলতঃ কাজের উপরে পারিশ্রমিক পায়। যার পরিমাণ ১০-৫৫০ টাকা পর্যন্ত। থ্রি-পিস, ওয়ান পিস, পাঞ্জাবী, কুশন কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়, যার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়। চুয়াডাঙ্গাতে সূচি কাজের থ্রি-পিস ও ওয়ান পিসের চাহিদা সব থেকে বেশি। ওয়েভ ফাউন্ডেশন সূচিপণ্য তৈরিতে উন্নত মান ও অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রমধর্মী নকশার সূচিশিল্প তৈরি করার চেষ্টা করছে। তবে, সমাজের তথা চুয়াডাঙ্গা জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মূখ্য ভূমিকা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়।[৫৫] সূচিশিল্পের মধ্যে নকশি কাঁথা নিয়ে কাজ করছেন ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপার একজন সূচিশিল্পী। এখানে ব্যতিক্রম হল যে, তিনি একজন পুরুষ। ব্যতিক্রম এই কারণে যে, সূচিশিল্পের কাজ সাধারণত মহিলাদের দখলে। সেখানের পুরুষের উপস্থিতি একেবারেই সীমিত। তাই শৈলকুপার মোঃ আমিনুল ইসলাম সূচিশিল্পের ক্ষেত্রে একজন ব্যতিক্রমী উদাহরণ। দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁর সংগঠিত সূচিশিল্পের দল রয়েছে। বর্তমানে সেখানে দেড় হাজারের মত সদস্য নিয়ে নকশি কাঁথা, পোশাক ও বিভিন্ন গৃহসজ্জায় ব্যবহার উপযোগী সূচিশিল্পের কাজ করছেন।[৫৬]

১৯৯০ সালে কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসার পর এক সময় দেশের শীর্ষ ফ্যাশন হাউস আড়ং-এর একজন প্রোডিউসার হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি 'বাংলা সেলাই' নামে নিজের ব্র্যান্ড তৈরির চেষ্টা করছেন। তাঁর কারখানা রয়েছে ঢাকার দক্ষিণখানের সায়েদাবাদে। এছাড়া টাঙ্গাইল, রংপুর, নরসিংদী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় দেড় হাজার সূচিকর্মী রয়েছে, যারা আমিনুল ইসলামকে সূচিকর্মের কাজ সরবরাহ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তিনি শুধু নিজ জেলায়ই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের এই সূচিশিল্প তথা নিজের কাজকে প্রদর্শন করতে দেশের গন্ডি পেরিয়ে গিয়েছেন কোরিয়া, ভারত, পর্তুগাল, জাপান, হংকং। এসব দেশ থেকে পেয়েছেন ব্যাপক প্রশংসা ও উৎসাহ। (চিত্র: ১২৫)।

খুলনার তুঁতপাড়া এলাকার সূচিশিল্পী, উদ্যমী গৃহভিত্তিক উদ্যোক্তা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভাপতি নূরুন নাহার লিলি। ২০১২ সালে নিজের বুটিকের কাজ শুরু করেন যা ২০১৫ সালে 'লিলি বুটিক এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' হিসেবে শো-রুম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে (৮৫,০০০/- থেকে ৩,০০,০০০/-পর্যন্ত টাকা ঋণ নেয়া যায়) ২০০৮ সালে তিনি এই সূচিশিল্পের ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প যেমন-ব্লক, বাটিক, সিরামিক, মোম, ফাস্টফুড ইত্যাদির উপর ১৯৯৫-১৯৯৮ ও ২০০১ সালে যুব উন্নয়ন, সিঙ্গার বাংলাদেশ টেইলারিং লিঃ এবং আরম্ভি ট্রেইনিং

[৫৫] সাক্ষাৎকার, ফারহানা সুলতানা মুক্তা, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, চুয়াডাঙ্গা।

[৫৬] আমিনুলের নকশি ভূবন,
https://www.ajkerpatrika.com/165690/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%A8

সেন্টার (খুলনা) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বর্তমানে নিজে উদ্যোক্তা হয়েছেন আবার বহু অসহায়–গরীব লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন। তবে, খুলনায় সূচিকর্মীদের চাহিদা বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছেন বলে, তিনি মনে করেন। কারণ খুলনা জেলার পাটকল, রাইসমিল, মাছের ঘের ইত্যাদি থাকায় অধিকাংশ প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ সেখানে কাজ করে, ফলে সূচিকাজে যারা আসে তুলনামূলকভাবে তাঁদের চাহিদা ও পারিশ্রমিক বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সূচিকর্মীদের ২০০০-৩০০০ টাকা দিতে হচ্ছে। নূরুন নাহার লিলি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি ফিল্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বটিয়াঘাটা, ফকিরহাট ইত্যাদি। তিনি তাঁর সূচিশিল্পের প্রতিষ্ঠানটি অনলাইন–অফলাইন ও মেলা ইত্যাদি মাধ্যমে পরিচালনা করছেন।

সূচিশিল্প মানুষ যে শুধু প্রয়োজনের তাগিদে বা অর্থ উপার্জনের জন্য করছেন তা নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। সূচিশিল্পের প্রতি ভালোলাগা এবং শখের খোরাক জোগাতেও অনেক মানুষ সূচিকাজ করে থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ সেগুলো সরাসরি ক্রেতার নিকট বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন আবার কেউ বা নিজ গৃহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে সূচিনকশা করে এবং আত্মীয় স্বজনকে নিজ হাতে তৈরি সূচিশিল্প উপহার দেবার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অর্থ উপার্জন করছেন। সেই সাথে অর্জন করে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রশাংসা ও বিশেষ সমাদর।

কুষ্টিয়ার ইসলামিয়া কলেজের প্রভাষক সাদিয়া ফারজানা মহুয়া, সূচিশিল্পকে ভালবেসে, শখ ও সৌখিনতাকে আরও একধাপ এগিয়ে রাখার জন্য কাজ করছেন বিভিন্ন ধরনের সূচিশিল্প নিয়ে। সম্পূর্ণ ব্যক্তি পর্যায়ে ২০০৩ সাল থেকে শুরু করেন সূচিকর্মের আনুষ্ঠানিক কাজ। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় সূচিকর্মের কাজ হচ্ছে, যেমন–হরিপুর, ত্রিমোহিনী, জুগিয়া, বারখাদা ইত্যাদি অঞ্চল বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি নিজে যেমন সূচিকাজে আগ্রহী তেমনি যারা এই ধরনের কাজ করে অবসর সময়কে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চান এমন কিছু মানুষও তাঁর সাথে কাজ করছে। মহুয়া জানান বর্তমানে অধিকাংশ গৃহবধূরা ঘরের বাইরে কাজ করতে পারছেন, ফলে অতীতের তুলনায় সূচিকর্মীর চাহিদা কম। এছাড়াও বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রতিষ্ঠান যেমন–আড়ং এর মাঠ পর্যায়ে কর্মীরা তাদের প্রডাকশনের কাজে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সূচিকর্মী নিয়োগ দিচ্ছে বিধায় স্থানীয় সূচিশিল্পের উদ্যোক্তারা সূচিকর্মীদেরকে কম পাচ্ছে বা তাদের পারিশ্রমিক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তাঁর সাথে ৩০ জন সূচিকর্মী কাজ করছে। নকশিকাঁথা, নকশি চাদর, কুশান কাভার, টেবিল রানার ইত্যাদি পণ্য তৈরি করছেন। ৬০০০-১০০০০/- টাকার মূল্যের নকশি কাঁথা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যান্য সূচিপণ্যও রাখছেন প্রচলিত বাজারমূল্যের সাথে মিল রেখে। তবে, নকশি কাঁথার চাহিদা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। বরং নকশি চাদর, কুশন কভার ইত্যাদির চাহিদা বেশি। সূচিশিল্প তৈরির

উপাদান যেমন: কাপড়– সুতি, ব্যাক্সি কটন, অরগেন্ডি, পপলিন ইত্যাদি কুষ্টিয়ার পোড়াদহ ও ইসলামপুর থেকে কিনে থাকেন। সুতার মধ্যে ব্যবহার করছেন রেয়ন সুতা (৫০০ টাকা) সিল্ক সুতা (৩০০ টাকা) ইত্যাদি।

শখ ও ভালবাসা নিয়ে কাজ শুরু করলেও সূচিশিল্পের মাধ্যমে যেন সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন সেটা তিনি সবসময় অনুধাবন করেন এবং সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন। সূচিকাজের ট্রেডিশনাল নকশাকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। (চিত্র: ১২৬)।

সূচিশিল্প ঐতিহ্যবাহী শিল্প হলেও তরুণ প্রজন্মের কাছেও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং আগ্রহের কেন্দ্রস্থল। সাতক্ষীরার মারিয়া আক্তার একজন তরুণ ও নবীন সূচিশিল্পী। নিজের অবসর সময়কে আনন্দপূর্ণ করতে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং নিজ গৃহে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সূচিশিল্পের সৃজনশীল কাজ শুরু করেছেন। সূচিশিল্পের উপর কোন রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের আগ্রহ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সূচিকাজ শিখে নতুন নতুন কাজ করছেন। যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিশ্বাসী এবং সৃজনশীল কাজের সাথে সম্পৃক্ত করছে, পরিবারের সদস্যদেরকে উপহার দিচ্ছে আনন্দঘন পরিবেশ। (চিত্র: ১২৭)।

খুলনা বিভাগের এমন বিভিন্ন জেলার আনাচে–কানাচে প্রচুর সূচিশিল্পী ও সূচিকর্মী রয়েছেন। যারা শখ ও সৌখিনতার জন্য আবার কেউ পেশা হিসেবে এবং অনেকেই খন্ডকালীন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যে যেভাবেই সূচিকর্মকে নিয়ে কাজ করছে তা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করছে। খুলনা বিভাগ সাধারণত কৃষি প্রধান অঞ্চল। সাদা মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন কাজের সুযোগ থাকলেও এমন সৃষ্টিশীল কাজের সাথে শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ সূচিশিল্পের সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে এই কাজকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

৫.১ সমাজে সূচিকর্মীদের অবস্থান

খুলনা বিভাগের সকল জেলা, উপজেলা ও গ্রামে সূচিশিল্পের প্রচলন রয়েছে। তবে, কর্মীরা অধিকাংশ বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রামেই বসবাস করে থাকে। কারণ, গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা এই কাজের সাথে বেশি যুক্ত। সূচিশিল্পের উদ্যোক্তারা অধিকাংশ জেলা শহরে তাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন এবং সেই জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছোট ছোট দল বা ফিল্ড রেখেছে; যেখানে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করছে। প্রধান সূচিশিল্পীরা তাদের নকশা ও উপকরণ এসব ফিল্ডে পৌঁছে

দেন এবং কাজের উপর ভিত্তি করে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। এর ফলে, গ্রামীণ নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তবে, এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সূচিকর্মীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অধীনস্ত হয়ে কাজ করায় যে পরিমাণ অর্থ আয় করছে তা বর্তমান বাজারমূল্যের তুলনায় অনেক কম। সূচিকর্মীরা শুধু উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাজারজাতকরণের অন্যান্য পর্যায়, বিশেষ করে যে সূচিপণ্য তাঁরা তৈরি করছে তার বাজারমূল্য বা বিক্রয়মূল্য অধিকাংশই থাকছে অন্ধকারে। এর ফলে, সূচিকর্মীরা পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে কিনা এ নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, সূচিশিল্পের মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্র বাড়লেও কর্মীদের আর্থ–সামাজিক অবস্থানের খুব বেশি উন্নতি ঘটছে না। তারা যে নিম্নবিত্ত সমাজে বাস করতো, সেখানেই থাকছে।

সূচিপণ্যের চূড়ান্ত বাজারমূল্য নির্ধারণে বা তার লভ্যাংশে কর্মীদেরকে যদি সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সূচিশিল্পের কাজ আরও সমৃদ্ধ হবে।

যারা একান্ত ব্যক্তি পর্যায়ে সূচিকাজ করছেন অর্থাৎ নিজেই কর্মী আবার নিজেই উৎপাদক ও বিক্রেতা তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয় সূচিপণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারণে বা বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতায়। কারণ, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান সমাজে নিজেদের ব্র্যান্ড সৃষ্টির মাধ্যমে একটি দৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি করার কারণে এক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং কিছু অসহায় ও দরিদ্য জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করছে। ব্যক্তি পর্যায়ের সূচিশিল্পীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। তাই, এই কারুশিল্পকে উন্নত করার লক্ষ্যে এবং এর সাথে জড়িত সকল শ্রেণির মানুষকে উন্নত সুযোগ–সুবিধা দেয়ার জন্য পুঁজিবাদী শ্রেণির দৌরাত্ম বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়ে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বাজারনীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পীদের নান্দনিক বোধ

সূচিশিল্পে যে ধরনের নকশা দেখা যায় এবং যেসব নকশার প্যাটার্নে ভিন্নতা পাওয়া যায় তা মূলত সূচিসামগ্রীর ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যেমন: নকশি কাঁথা বা চাদর যে কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে, পোশাক ও ব্যাগ ভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে তৈরি, তাই ব্যবহার ভেদে এসব সামগ্রীর গঠনমূলক নকশাতেও সেই পার্থক্য দেখা যায় এবং আলংকারিক নকশাতেও সেই পার্থক্য বিদ্যমান। সূচিশিল্পে নকশা সজ্জামূলক বা জমিনের নকশা হিসেবেই তৈরি করা হয়। সাধারণত রেখাচিত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট এসব নকশাকে সুচ–সুতার উপযুক্ত ফোঁড়ের মাধ্যমে আকর্ষণীয় রূপ দেয়া হয়।

খুলনা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সূচিশিল্প দেখা যায়, সেখানকার নকশা ও রঙ সমগ্র বাংলাদেশে প্রাপ্ত সূচিনিদর্শনেরই অনুরূপ। তবে, সূক্ষ্ম ও নিখুঁত সূচিকর্মের জন্য বিখ্যাত হল যশোরের সূচিশিল্প। এখানকার সূচিশিল্পীরা এলাকার মানুষের বা ক্রেতাদের চাহিদানুয়ায়ী নকশা করে থাকেন। এখানে, উল্লেখ্য যে, যারা নকশাকার বা ডিজাইনার তারা কেউ চিত্রাঙ্কনের উপর উচ্চ ডিগ্রী সম্পন্ন নয়। খুলনা বিভাগের সূচিশিল্পীরা অধিকাংশই উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তাছাড়াও, যেহেতু সূচিশিল্পের সূচনা নকশি কাঁথা থেকে হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, সেক্ষেত্রে বলা যায় যে, নকশি কাঁথায় যে লৌকিক নকশা দেখা যায়, তাও চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা অঙ্কিত ছিল না। সুতরাং, এক্ষেত্রে লোকশিল্প নকশি কাঁথা আর বর্তমান নগর শিল্প সূচিশিল্পের নকশা অঙ্কনের দিকে একটি মিল পাওয়া যাচ্ছে।

রঙের ব্যবহার

সূচিশিল্পের নকশায় উজ্জ্বল ও বাহারি রঙের উপস্থিতি দেখা যায়। কখনও বা নকশার প্রয়োজনে কখনও বা ব্যবহারের সাথে মিল রেখে রঙকে বেছে নেয়া হয়। সূচিশিল্পীরা যেহেতু তাদের শিল্পকর্মগুলো ছোট বড় বিভিন্ন ফোঁড়ের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন, সেহেতু সেই ফোঁড়গুলো যেন সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিল্পের জমিন ও সুতার রঙ নির্বাচিত হয়। বিশেষ করে সূচিশিল্পের সামগ্রী বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে তাই উৎসব ভিত্তিক সামগ্রীগুলোতে লাল রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। লাল রঙের চাদরে সোনালি রঙের সুতা দ্বারা করা নকশি চাদরের চাহিদা রয়েছে। এখানে লাল রঙকে বাংলাদেশের বিবাহের প্রধান রঙ হিসেবে দেখা যায়। আর সোনালী রঙের ব্যবহারে সেখানে আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তবে, সিল্ক বা সুতি সুতায় সরাসরি সোনালি রঙ সেভাবে পাওয়া যায় না, তাই সোনালী রঙের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রঙের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যেহেতু বিপরীত রঙের ব্যবহারে নকশা বেশি আকর্ষণীয় হয়, তাই সূচিশিল্পীরা পোশাকের নকশায় সুতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিপরীত রং–এর ব্যবহার

বেশি করে থাকেন। যেমন: লাল শাড়িতে সবুজ–হলুদের কাজ, নীল জামায় কমলা রং–এর প্রাধান্য ইত্যাদি। (চিত্র: ১২৮)।

দেওয়ালসজ্জার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কালো রঙের জমিন লক্ষ্য করা যায় এবং তার উপরে চিত্রের বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে সুতার রঙ নির্বাচন করা হয়। যেমন: পাতা বা ডালে সবুজ বা জলপাই রং আবার ফুল, পাখি, হরিণ ইত্যাদিতে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙ দেখা যায়। (চিত্র: ১২৯)।

সূচিশিল্পের জমিনে সাদা রঙকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ সাদা রঙের জমিনে সর্বোচ্চ বৈচিত্রময় রঙের ব্যবহার করা যায়। শাড়ি, কুশান কাভার ও পোশাকে প্রায় সর্বত্রই সাদা জমিন দেখা যায়। সেখানে বিভিন্ন ধরনের রঙের সমাহার ঘটিয়ে সূচিশিল্পের মান ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। (চিত্র: ১৩০)।

অধিকাংশ সূচিনকশায় শেড সুতার ব্যবহার, যেখানে একটি নকশাতেই একাধিক রঙের উপস্থিতি দেখানো হয় শেডের সুতার মাধ্যমে। (চিত্র: ১৩১)। যেমন: একটি গোলাপ ফুলকেই লাল, গোলাপি, সাদা ইত্যাদি রঙের শেড দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। বাজারে এই ধরনের এক জাতীয় বা বিপরীত রঙের মিশ্রণে প্রচুর শেডের সুতা পাওয়া যায়। নকশার মধ্যে নতুনত্ব ও চমক সৃষ্টি করতে শেডের সুতার ব্যবহার বেশি করা হয়ে থাকে। (চিত্র: ১৩২)। তবে, ঐতিহ্যবাহী নকশার ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের সুতার ব্যবহার হয় না। এখানে একক উজ্জ্বল রঙ, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ঐতিহ্যবাহী সূচিনকশার রঙের সাথে মিল রাখতে এবং অনুকরণমূলক কাজের ক্ষেত্রে ও একই ঘরানা বজায় রাখার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙের ব্যবহারই হয়ে আসছে বর্তমানের নকশি কাঁথাতেও।

সূচিনকশার রঙে সূচিশিল্পীর মনজগৎ বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন: কুষ্টিয়ার প্রয়াত রাবেয়া খাতুনের ১৯৫৮ সালে সেলাই করা একটি শাল পাওয়া গেছে; যেখানে ঘিয়ে রঙের জমিনে সবুজ রঙের ডুরে পাড় দেখা যায়। তবে জানা যায় যে, এই সবুজ রঙের অংশগুলো পূর্বে লাল রঙের ছিল কিন্তু রাবেয়া খাতুন তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর লাল রঙের নকশার সুতাগুলো সম্পূর্ণ তুলে ফেলে সেখানে সবুজ রঙের নকশাটি করেন।

বাংলাদেশের সমাজে সাধারণত বিধবা নারীরা লাল বা যেকোন গাঢ় রঙকে পরিহার করেন এবং এই শালটিতে লাল রঙ উঠিয়ে সবুজ রঙের নকশা করার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার সেই প্রচলিত ধারাটিই লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র: ১৩৩)।

নকশার ব্যবহার

ঐতিহ্যবাহী সূচিশিল্পের নকশার অনুকরণে সাধারণত নকশি চাদর ও কাঁথা করা হয়। এসব চাদর বা কাঁথার মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র করে গোলাকারে নকশার বিস্তৃতি ঘটে। এই ধরনের নকশার সাথে গ্রাম–বাংলার ঐতিহ্যবাহী আলপনার নকশার মিল লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র: ১৩৪- ক ও খ)।

এই ধরনের আলপনা ভিত্তিক নকশায় প্রচলিত কিছু লোক-মোটিফও লক্ষ্য করা যায়। যেমন: হাতি, ময়ূর, কলকা, মাছ, পেঁচা, জীবনবৃক্ষ, কুলা, কলসি, ঢোল, চাকা, নৌকা, খেজুর গাছ, কুঁড়ে ঘর, সূর্য ইত্যাদি। (চিত্র: ১৩৫)।

এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি মোটিফেরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ অর্থ। তবে, সেই অর্থানুসারে সূচিশিল্পীরা যতটা না মোটিফগুলো ব্যবহার করছেন, তার থেকে অনেক বেশি ডিজাইন কম্পোজিশনের জন্য ব্যবহার করছেন। এই ধরনের নকশায় গোলাকার ভারসাম্য বা Radial Balance লক্ষ্যণীয়। (চিত্র: ১৩৬)। এখানে ২-৩ ধরনের মোটিফের পুনরাবৃত্তি ছন্দ দেখা যায়। (চিত্র: ১৩৭)। জমিনে নকশাকে বিস্তৃত করতে মোটিফের সাথে সাথে কিছু অলঙ্কৃত বন্ধনীর পৌনঃপুনিক ব্যবহার থাকে। যেগুলোর অধিকাংশই পুষ্পিত লতার আকৃতি দেখা যায় আবার নকশি কাঁথার কিছু ঐতিহ্যবাহী তাগা বা পাড়ের নকশা রয়েছে, যে পাড়ের নকশাকে স্থানীয়ভাবে গোলক ধাঁধা নকশা বা পাড় বলে। সেগুলোও ব্যবহৃত হয়। (চিত্র: ১৩৮)।

নকশি কাঁথায় পাড়ের নকশাগুলো কখনও কখনও একই সমান্তরালে পাশাপাশি রেখে জমিনের পাশ বা নকশার বন্ধনী আকারে ব্যবহৃত হয়। এখানে, এই পাড়গুলো ব্যবহারের প্রসঙ্গে সূচিশিল্পীরা জানান, এগুলো প্রাকৃতিক নকশা ও নকশি ফোঁড়ের মধ্যে বৈচিত্র আনয়নের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু, তাগা বা পাড়ের নকশাগুলো বিশেষ উপায়ে ঘর বুনে সৃষ্টি করা হয়, তাই এই নকশাগুলো ভরাট বা কাঁথা স্টিচ থেকে দেখতে ভিন্ন রকম হয়। অনেকটা রৈখিক চিত্রের মত দেখা যায়। তাই ভরাট নকশার মাঝে মাঝে এই ধরনের দৃঢ় রৈখিক নকশা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (চিত্র: ১৩৯)।

গ্রামীণ পটভূমির নকশায় গ্রাম–বাংলার উপাদান একই সাথে দেখা যায়। যেমন: হাড়ি, কলসি, কুলা, কুঁড়ে ঘর, সূর্য। অর্থাৎ নকশায় যে মোটিফগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে তা অধিকাংশই গ্রামীণ চাল–চিত্রকে তুলে ধরার জন্যই এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই উপাদানগুলোকে নকশা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। (চিত্র: ১৪০)।

সূচিশিল্পের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সূচিশিল্পীরা সূক্ষ্ম জ্যামিতিক হারের ব্যবহার করে থাকেন। শিল্পের জমিনকে সমানুপাতিকহারে বর্গাকারে ভাগ করে সেখানে পারস্পারিক নকশার ব্যবহার দেখা যায়। এ ধরনের

নকশায় শিল্পের জমিন অনেক বেশি সংঘবদ্ধ দেখা যায়। বর্গাকার ঘরগুলোকে ক্রস স্টিচ বা কাস্তে ফোঁড় দ্বারা রেখার মত করে ফুটিয়ে তুলে ঘরগুলোতে সেট আকারে নকশা করা হয়। (চিত্র: ১৪১)। জ্যামিতিক নকশার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের জামদানি শিল্প। যে কোন নারীর কাছে জামদানি শাড়ি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই জামদানি শাড়ির পাড় ও জমিনে যে ধরনের নকশা দেখা যায়, সূচিশিল্পের শাড়িতে সেই নকশার অনুকরণ দেখা যায়। তবে, এখানে হুবুহু নকশাকে তুলে নিয়ে আঁকা হয় এবং নকশাটি ফুটিয়ে তোলা হয় শিল্পীর পছন্দমত রঙ ও সুতায়। (চিত্র: ১৪২)।

বয়ন শিল্পে কাপড় বুননের মাধ্যমে যে ধরনের নকশা দেখা যায়। সুচ–সুতার মাধ্যমে চটের উপর সেই নকশাগুলো সাধারণত 'ক্রস স্টিচ' দ্বারা করা হয়। প্রাকৃতিক নকশা থেকে জ্যামিতিক নকশা, ইসলামিক রীতির নকশা প্রভৃতি ধরনের বিভিন্ন চিত্র চটের উপর সর্বব্যাপী করা হয়। চট দ্বারা হিন্দুদের পূঁজার আসন আবার মুসলিমদের জায়নামাজ তৈরি করা হয়, যেখানে সুচ–সুতার মাধ্যমে করা নকশা চটকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সেই নকশাগুলো মূলত ধর্মীয় নকশা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে সূচিনকশায় বিষয়বস্তুও ক্ষেত্র বিশেষ নির্বাচিত হচ্ছে। সূচিশিল্পী বেগম শিরিন শাহনেওয়াজের তৈরি একটি চটের জায়নামাজ পাওয়া যায়। যেখানে উলের রঙিন সুতার মাধ্যমে সম্পূর্ন জমিনে নকশা করা হয়েছে। একটি গম্বুজ ও দুইটি মিনার বিশিষ্ট মসজিদের নকশাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ফুলেল লতার নকশা সন্নিবেশিত হয়েছে। (চিত্র: ১৪৩)।

খুলনা বিভাগের অধিকাংশ সূচিশিল্পী ঐতিহ্যবাহী প্রাণি–মোটিফের নকশা নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করলেও বর্তমানে সূচিশিল্পের বাজারে এই ধরনের নকশার চাহিদা কম থাকায়, শিল্পীরা অনেকটাই বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশার চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। যার, ফলে শিল্পীদের মনে একটি শূণ্যতা তৈরি হয়েছে। ক্রেতার চাহিদানুযায়ী কাজ করতে গিয়ে স্বপ্রণোদিত নকশা সূচিশিল্পীরা খুব কম তৈরি করতে পারছেন।

তবে, সূচিশিল্প সাধারণত মানুষ ভাললাগা থেকে তৈরি করে থাকে। কোন একটি নান্দনিক নকশা বা চিত্রের সূচিশিল্প দেখে হুবহু তেমন শিল্প তৈরিতে শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সূচিশিল্পী বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ বলেন, একই নকশার সূচিশিল্প এক সাথে বসে ৩-৪ জন নিজ নিজ গৃহসজ্জায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি করতেন। কিন্তু তার মধ্য থেকেও নকশার সংযোজন–বিয়োজন করা হতো। যা সম্পূর্ণই শিল্পীর নিজস্ব নান্দনিকবোধের উপর ভিত্তি করতো। এখানেই একই সময়ে ও স্থানে পাশাপাশি বসে তৈরি একই নকশার দুইটি দেওয়াল সজ্জার তুলনামূলক বর্ণনা তুলে ধরা হল: (চিত্র: ১৪৪- ক. ও খ.)। এখানে চিত্র (ক)-এ নীল রঙের প্রাধান্য এবং চিত্র (খ)–এ কমলা রঙের প্রাধান্য দেখা যায় এবং চিত্র (খ)–এ একটি সূর্যের নকশা আছে। শিল্পী শাহীন সুলতানা জানান, অন্যদের থেকে আলাদা করার

লক্ষ্যে এই সূর্য দেয়া। অর্থাৎ, এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সূচিনকশায় অনুকরণপ্রিয়তা থাকলেও সেখানে শিল্পীরা সৃজনশীল বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখছেন নকশার সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে। হুবহু অনুকরণ করলেও ব্যক্তি বিশেষ হাতের কাজে পার্থক্য বিদ্যমান। একই নকশা, একই ফোঁড় হলেও রঙ, সুতা বা হাতের টানে সূচিনকশার নান্দনিকতায় ও শিল্পীদের নান্দনিকবোধে পার্থক্য দেখা যায়। এরকম আরো ২টি একই ধরনের দেওয়ালসজ্জা পাওয়া যায় যা বেগম শিরিন এবং শাহিন সুলতানা একই সাথে তৈরি করেন কিন্তু সেখানেও তাঁদের রঙ নির্বাচনে পার্থক্য পাওয়া যায়। (চিত্র: ১৪৫-ক. ও খ.)।

অতীতে সূচিশিল্প অধিকাংশই তৈরি হতো ঘরোয়াভাবে ব্যক্তিগত ব্যবহার বা প্রিয়জনকে উপহার দেয়ার জন্য। যেমন: কুষ্টিয়ার জাহানারা খাতুন ১৯৮৬-১৯৮৭ সালে নাতীর জন্য কাঁথা তৈরি করেন। (চিত্র: ১৪৬)। কিন্তু, বর্তমানে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করার ফলে, সূচিশিল্পীদের যে নির্মল মনের আনন্দ, বেদনা শৈল্পিক চেতনা ফুটে উঠতো তা আর এখন খুব একটা দেখা যায় না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে, আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সূচিশিল্পের নকশার ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী মোটিফ ও চিত্রের ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনের থেকে সজ্জামূলক নকশার সমাহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, সূচিশিল্প ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, ব্যবসার মাধ্যম ও অন্তঃসার শূণ্য শিল্পে রূপ নিচ্ছে।

সুপারিশমালা

বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের মানুষের জীবন–যাত্রায় পরিবর্তন আসছে, দিন দিন উন্নত থেকে উন্নতর হচ্ছে। শিল্প–সংস্কৃতি ও মানুষের রুচিতে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যার ফলে ঐতিহ্যবাহী অনেক শিল্পেরই নকশা, রঙ ও রঙের ব্যবহার বদলে গেছে। কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে আবার কিছু বিলুপ্তির পথে। কোন কোন শিল্প হয়তো নতুন রূপে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। সূচিশিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছে। যেখানে সূচিশিল্পের গন্ডি শুধুমাত্র গৃহের মধ্যে আবদ্ধ বা গ্রামীণ নারী সমাজের ভিতরেই ছিল সেখানে বর্তমান সময়ে সূচিশিল্প প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। যা দেশ–বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে। রঙ–নকশা–উপকরণ সব মিলিয়ে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি পরিমার্জিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিকতা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের জন্য সূচিশিল্পের যে প্রকৃত আবেগ ও মূল্যবোধ ছিল তা এখন অনেকটাই বিলীন হতে বসেছে। যেমন- অতীতে পুরাতন শাড়ি বা ছিন্ন বস্ত্রকে জোড়া দিয়ে তৈরি হত নকশি কাঁথা। যে কাঁথায় আঁকা হতো শিল্পীর আবেগ ভরা ভিন্ন ভিন্ন গল্প। একটি পুরাতন বস্ত্রকে আবারও নতুন করে, আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার অন্যরকম প্রচেষ্টা থাকত। গৃহের আসবাবপত্রের আচ্ছাদন থেকে আরও অন্যান্য সজ্জায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার হতো সূচিকর্ম। যেমন: আরশিলতা, বালিশের কভার, টেবিল ক্লথ, সেতার, তানপুরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদির আবরণী, জপমালার থলি, পান–সুপারির খিচা, তসবী, কুরআন শরীফ রাখার ঝোলা প্রভৃতির উপর থাকতো পরম মমতায় করা নকশা। বর্তমানের সূচিশিল্পে এই মমতা ও আবেগ অনেকটাই উপেক্ষিত থাকছে। সেখানে পুরাতন কাপড়ের গল্প গাঁথার থেকে চকচকে আধুনিক সজ্জামূলক নকশা ও উপাদানের ভিড় জমেছে। বাজার থেকে পছন্দের শিল্পকর্ম কিনতে ও ক্রেতার চাহিদানুযায়ী সূচিকর্ম করতেই আগ্রহী এখনকার মানুষ। এখানেও উন্নতমানের নান্দনিকতা বিরাজমান। আধুনিক মেশিনের সাহায্যে করা সূচিনকশার থেকেও হাতের সাহায্যে সুচ–সুতার কাজেরই চাহিদা বা আকর্ষণীয়তা বেশি রয়েছে, কিন্তু তারপরেও গ্রাম–বাংলার সহজ–সরল গৃহকোণের গল্পগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হতে বসেছে। তাই, সূচিশিল্পের এই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী অন্তর্নিহীত ভাবকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা ও অন্যান্য সূচিকর্ম সম্পর্কে বিশেষ প্রচারণার ও পৃষ্ঠপোষকতার।

খুলনা বিভাগকে এই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করার অন্যতম কারণ অতীত ঐতিহ্য। সেই মুঘল যুগ থেকে যশোরের সূচিশিল্প বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে যশোরের সূচিকাজ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এখনও বিশিষ্টজন ও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সেইসব সূচিশিল্প রাখা আছে, তবে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় যশোর তথা সমগ্র খুলনা এলাকার সূচিশিল্প নিয়ে গবেষনামূলক কাজ কম হয়েছে। হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যবাহী সূচিশিল্পগুলো। খুলনা বিভাগের

সূচিশিল্প নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন বই নেই। সুতরাং, এখনো যে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মগুলো রয়েছে, সাধারণত যেসব সূচিকর্ম বর্তমানে আর খুব বেশি দেখা যায় না বা তৈরি হয় না সেগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সূচিশিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রায় সকল বিভাগের জেলাগুলোতে সূচিশিল্পের সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম তৈরি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজে সুবিধা হবে। আঞ্চলিক সূচিশিল্পীদের বাৎসরিক সম্মেলন ও মেলার ব্যবস্থা করলে পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। প্রায় সব অঞ্চলে দেশজ উৎসবের আয়োজন হলে শিল্প বিনিময় ঘটবে। প্রকৃত সূচিশিল্পীদের জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করা, তাঁদের কর্মভাবনা ও নান্দনিকবোধকে সকলের সামনে নিয়ে আসা এবং কাজকে আরও উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করা উচিৎ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে সূচিকর্মী ও সূচিশল্পীদের কর্মজীবন এবং কাজের অনুপ্রেরণামূলক প্রোগ্রাম প্রচারের মাধ্যমে জনগণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও সূচিশিল্পের মূল্যবোধকে ধরে রাখার প্রয়াস ব্যক্ত করা যেতে পারে।

খুলনা বিভাগের সূচিশিল্প সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক তা হলো, বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কোন তথ্য কেন্দ্র নেই। ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা সূচিশিল্পী ও কর্মীদেরকে একত্রিত করার মতো কোন ব্যবস্থা না থাকা। ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচিত মাধ্যমে সূচিশিল্পীরা তাদের কর্ম ও জীবনমান নিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে জানাতে আগ্রহী হলেও এর ব্যতিক্রম রয়েছে। যারা অনেক বেশি পেশাদারী মনোভাবাপন্ন। তারা শিল্পকে যতটা না কদর করছেন তার থেকে ব্যবসাকে মূখ্য করে তুলছেন। ফলে, সূচিশিল্পের প্রকৃত মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হচ্ছে। তাই শিল্পকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে সমাজে বিশেষ স্থান দেবার প্রচেষ্টা করা উচিৎ ব্যক্তি পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে। বংশ পরম্পরায় যারা সূচিকর্ম করছে, তাঁদের কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এই শিল্পকে দৃঢ় রাখা যায়। অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, এই ধরনের গঠনমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সূচিশিল্পের বিলীয়মান আবেগ ও মূল্যবোধ ধরে রাখা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশের বস্তুগত সংস্কৃতির অন্যতম ধারক নকশি কাঁথা। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে শীতের প্রকোপ খুব বেশি না থাকায় কাঁথার প্রচলন ঘরে ঘরে। দৈনন্দিন জীবনের এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীটিকে আকর্ষণীয় করা থেকেই সৃষ্টি হল এক অনন্য শিল্পের। যা নকশি কাঁথার সীমা ছাড়িয়ে সূচিশিল্পের বৃহৎ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্য, আনুষ্ঠানিক পোশাক-পরিচ্ছদ- শাড়ি, পাঞ্জাবী, গহনা, ব্যাগ, জুতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সূচিশিল্পের ব্যবহার রয়েছে। দেশের সর্বত্র রয়েছে সূচিশিল্পের বিভিন্ন বৈচিত্রময় উপাদান। রঙিন সুতার বিচিত্র নকশা সকলের মনে আনন্দ দিয়ে থাকে এবং রুচিশীল ও শৈল্পিক পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। খুলনা বিভাগের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে সূচিশিল্প বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সূচিকাজের সাথে যুক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে অসহায় ও দুস্থ নারীদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, শিল্প যখন ব্যবসা ক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখন শিল্পের আবেগ ও নান্দনিক মূল্য অনেকটাই গৌণ হয়ে যায়। অতীতে সূচিশিল্প তৈরিতে শিল্পীর যে আত্মীক টানের বিবরণ পাওয়া যায় তা, বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই বেশি সূচিকর্ম উৎপাদিত হচ্ছে। তবে, কিছু শিল্পরসিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এখনো সূচিশিল্পের সেই নান্দনিক আবেগকে ধরে রাখতে ও সূচিশিল্পকে প্রকৃত অর্থে শিল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচয় করাতে নিরলস পরিশ্রম করছে। অঞ্চলভেদে, মানুষের জীবন–যাত্রার মান অনুযায়ী সূচিশিল্পের ধরন ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ সূচিশিল্পের সাথে যুক্ত। যারা প্রতিনিয়ত তাদের কল্পনার রঙ ও চিত্রকে হাতের বিশেষ কৌশলে ফ্রেম বন্দী করছেন। অপার্থিব আনন্দ খুঁজে নিচ্ছেন সুচ–সুতার ফোঁড়ে। যুগের পরিবর্তনে সূচিশিল্পের ব্যবহার ও নকশায় পরিবর্তন এলেও একটি বিশেষ স্থানে সূচিশিল্প একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর তা হল সুচ ও বর্ণিল সুতার আঁচড়ে নকশা তোলা, যেখানে প্রধান হাতিয়ার হল দুই হাত। তাইতো বিশ্বায়নের যুগেও সূচিশিল্পের মতো হস্তশিল্পের কদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে ও জীবনমান উন্নত করতে সূচিশিল্পকে ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পকলা চর্চার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মানুষ আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হচ্ছে তথা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

চিত্র: ক) ১৯৬০খ্রি. সময়ের মানচিত্রে খুলনা বিভাগ

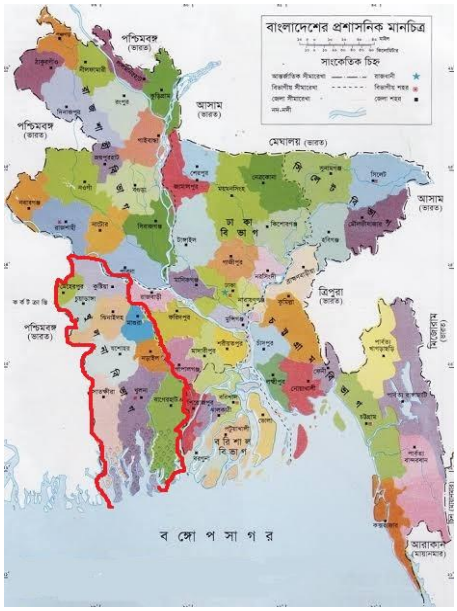

চিত্র: খ) বর্তমান সময়ের মানচিত্রে খুলনা বিভাগ

চিত্র: ০১- বাংলাদেশের মানচিত্র

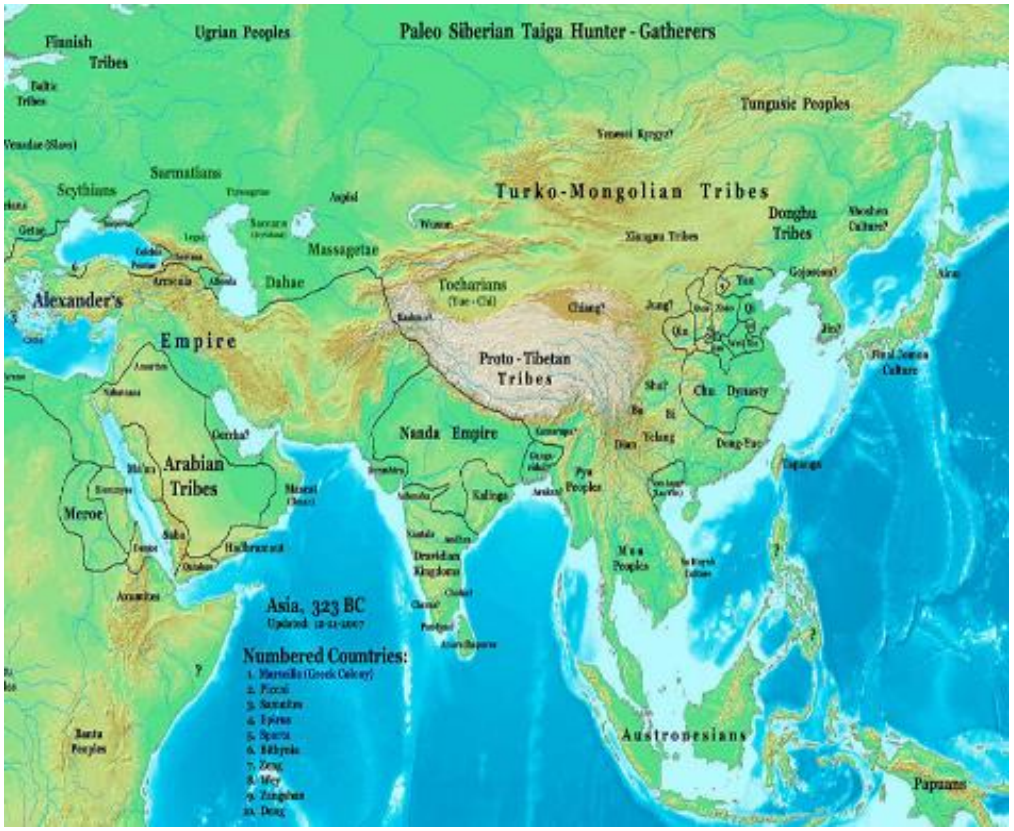

চিত্র: ০২- ৩২৩ খ্রি.পূ. সময়ের গঙ্গারিডাই রাজ্যের মানচিত্র

চিত্র: ০৩- প্রস্তর যুগের সুচ

চিত্র: ০৪- সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সুচ

চিত্র: ০৫- সিন্ধু সভ্যতার মূর্তির-(যাজক রাজা) পরিচ্ছদের নকশার সাথে সূচিশিল্পের সাদৃশ্য

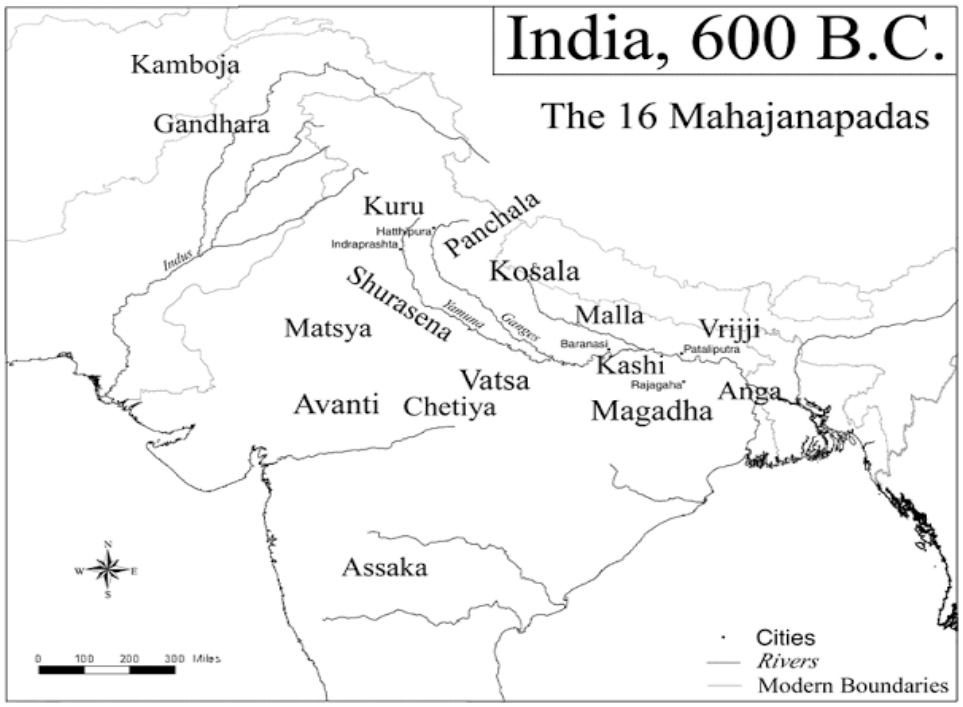

চিত্র: ০৬- ৬০০খ্রি. পূ. ভারতের মানচিত্র

চিত্র: ০৭- প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের ম্যানুস্ক্রিপ্টে অঙ্কিত চিত্র

চিত্র: ০৮- সাতগাঁও- এর লেপ কাঁথা

চিত্র: ০৯- ইন্দো-পর্তুগীজ কাঁথা

চিত্র: ১০- ইন্দো-পর্তুগীজ কাঁথায় মৎসকুমারির নকশা

চিত্র: ১১- লেডি, কার্জনের বিখ্যাত পিকক ড্রেস

চিত্র: ১২- রেজাই

চিত্র: ১৩- কশিদা

চিত্র: ১৪- ১৯ শতকে ঢাকায় প্রাপ্ত কশিদা

FIGURE 6 AND 7. Hunting coat, India, Mughal dynasty, ca. 1620–30. Embroidered satin with silk, 97 x 91.44 cm

FIGURE 8. Detail of the coat shown in figs. 6–7

চিত্র: ১৫- মুঘল আমলের শিকারের কোট

The Gown of the "Queen of Oudh," mid-19th century
India, Uttar Pradesh, Awadh
Silk with metal ribbon ornaments
Peshwaz – Length: 41 11/32 in.(106 cm); kaliondar paijama – Length: 41 11/32in. (106 cm) Victoria and Albert Museum, 0645 IS (peshwaz), 1646 IS (kaliondar paijama)
Photo © V&A Images. All Rights Reserved. Victoria and Albert Museum, London

চিত্র: ১৬- ঔধ রাজ্যের রাণীর পোশাক

চিত্র: ১৭- ১৯৬৬ সালে তৈরি একটি সূচিশিল্প

চিত্র: ১৮- আনুঃ ১৯ শতকে তৈরি, 'শতদল পদ্মমোটিভ' ও 'জীবন বৃক্ষ' মোটিফের সুজনি কাঁথা ঢাকা বিসিকে সংগৃহিত

চিত্র: ১৯- আড়ং-এর সূচিপণ

চিত্র: ২০- জয়িতার সূচিপণ্য

চিত্র: ২১- সূচিনকশায় পশু-পাখির মোটিফ

চিত্র: ২২- বিভিন্ন ধরনের পদ্ম মোটিফ

চিত্র: ২৩- সূচিকলায় গ্রামীণ চাল–চিত্র

চিত্র: ২৪- জীবনবৃক্ষ মোটিফ

চিত্র: ২৫- সূচিশিল্পে ইসলামিক মোটিফের ব্যবহার

চিত্র: ২৬- সূচিশিল্পে বিয়ের উৎসবের চিত্র

চিত্র: ২৭- বিভিন্ন নকশায় মেয়েলি আবেগের প্রতিচ্ছবি

চিত্র: ২৮- সূচিনকশায় আলপনা মোটিফ

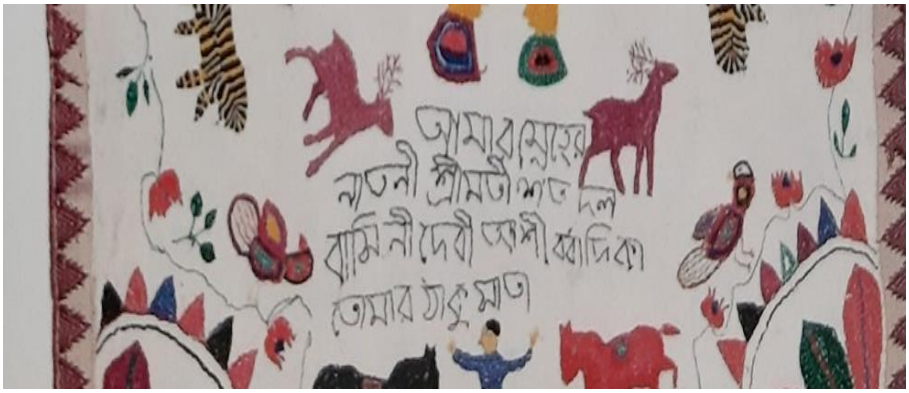

চিত্র: ২৯- সূচিশিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য মোটিফ

চিত্র: ৩০- বর্তমানে বহুল প্রচলিত নকশি চাদর

চিত্র: ৩১- সূচিশিল্পের জন্য ব্যবহৃত কাপড়

চিত্র: ৩২- বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের কুশন কভার

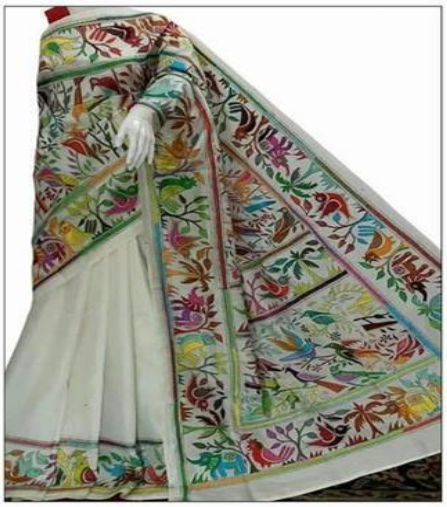

চিত্র: ৩৩- সিল্কের শাড়িতে সূচিকাজ

চিত্র: ৩৪- চটের ব্যাগে সূচিনকশা

চিত্র: ৩৫- সূচিকাজের গহনা

চিত্র: ৩৬-সূচিকাজের উপযোগী চট

চিত্র: ৩৭- সূচিশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সুতা

চিত্র: ৩৮- বাজারে প্রচলিত সূচিশিল্পের সুচ

চিত্র: ৩৯- প্রাচীন যুগের সুচ

চিত্র: ৪০- যশোর স্টিচ ৮নং সুচ

চিত্র: ৪১- চটের জমিনে সূচিকাজের উপযোগী সুচ

চিত্র: ৪২- সূচিনকশার আনুষঙ্গিক উপকরণ

চিত্র: ৪৩- সূচিকাজে ফ্রেমের ব্যবহার

চিত্র: ৪৪- আধুনিক ফোঁড়সমূহ

চিত্র: ৪৫- চেইন ফোঁড়

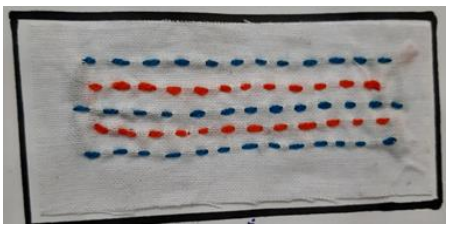

চিত্র: ৪৬- রান ফোঁড়

চিত্র: ৪৭- কেবল ফোঁড়

চিত্র: ৪৮- আঁটি বাঁধা ফোঁড়

চিত্র: ৪৯- ডাল ফোঁড়

চিত্র: ৫০- ভরাট ফোঁড়

চিত্র: ৫১-লেজি-ডেইজি ফোঁড়

চিত্র: ৫২- ক্রস ফোঁড়

চিত্র: ৫৩- হেরিংবোন ফোঁড়

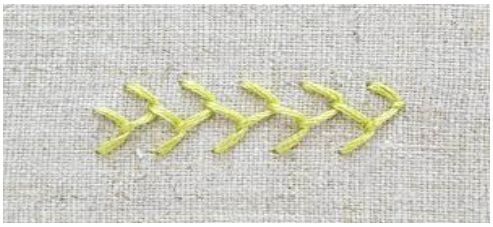

চিত্র: ৫৪- ফেদার ফোঁড়

চিত্র: ৫৫- ফ্রেঞ্চ নট

চিত্র: ৫৬- মাকড়শার জাল

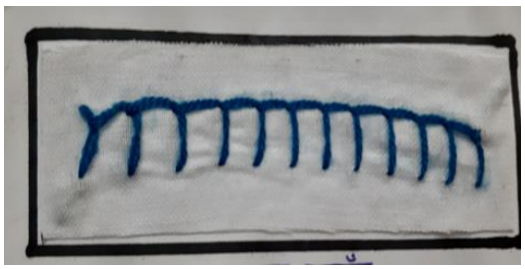

চিত্র: ৫৭- বোতামঘর ফোঁড়

চিত্র: ৫৮- হুইল ফোঁড়

চিত্র: ৫৯- কয়েক প্রকার ফোঁড়ের মাধ্যমে একটি কুশন কভারের নকশা

চিত্র: ৬০- বিভিন্ন ধরনের নকশি পাঁড়

চিত্র: ৬১- এপ্লিক

চিত্র: ৬২- কাঁটাকাজ

চিত্র: ৬৩- মেশিন এমব্রয়ডারি

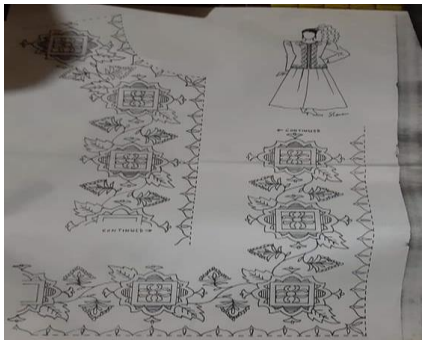

চিত্র: ৬৪- নকশার কাগজ

চিত্র: ৬৫- টাইডাই বা ব্লকের থ্রি-পিসে সুই সুতার নকশা

চিত্র: ৬৬- সুতি বা তাঁতের সুতার নকশা

চিত্র: ৬৭- যশোর স্টিচ

চিত্র: ৬৮- সাতক্ষীরার সূচিনকশায় পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

চিত্র: ৬৯- চামড়ার ব্যাগের সাথে সূচিনকশা

চিত্র: ৭০-চুমকি-গ্লাসের কাজের সূচিশিল্প

চিত্র: ৭১- কলকা মোটিফের শাল

চিত্র: ৭২- পাঞ্জাবীতে গুজরাটি ফোঁড়

চিত্র: ৭৩- নকশি চাদর

চিত্র: ৭৪- ফুলকারী নকশার আদলে সূচিশিল্প

চিত্র: ৭৫- নকশি চাদর

চিত্র: ৭৬-দূর্জানি কাঁথা বা থলে

চিত্র: ৭৭- লেপ কাঁথা

চিত্র: ৭৮- আরশিলতা

চিত্র: ৭৯- লেপ কাঁথা

চিত্র: ৮০- লেপ কাঁথা

চিত্র: ৮১- আসন কাঁথা

চিত্র: ৮২- ১৯৯০-১৯৯২ সালে করা কাজ

চিত্র: ৮৩- ময়ূয়ের নকশার প্লেট

চিত্র: ৮৪- তেলাপিয়া মাছের চিত্র

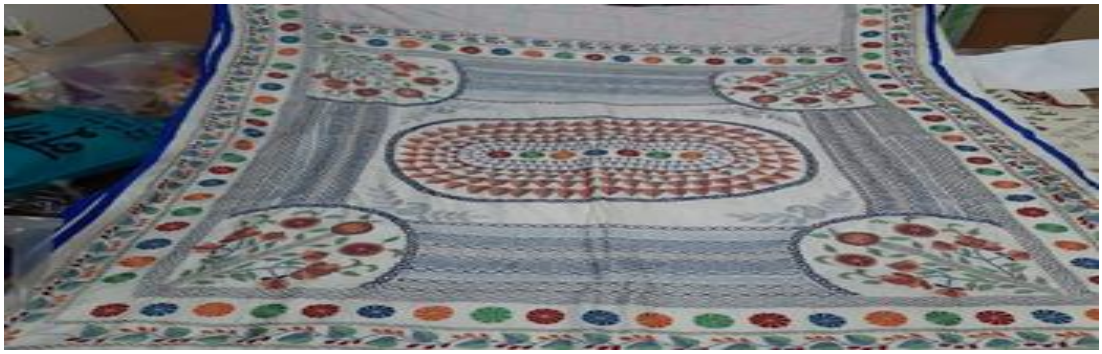

চিত্র: ৮৫- শাড়ির আঁচলে বিভিন্ন পাড় ও মোটিফ

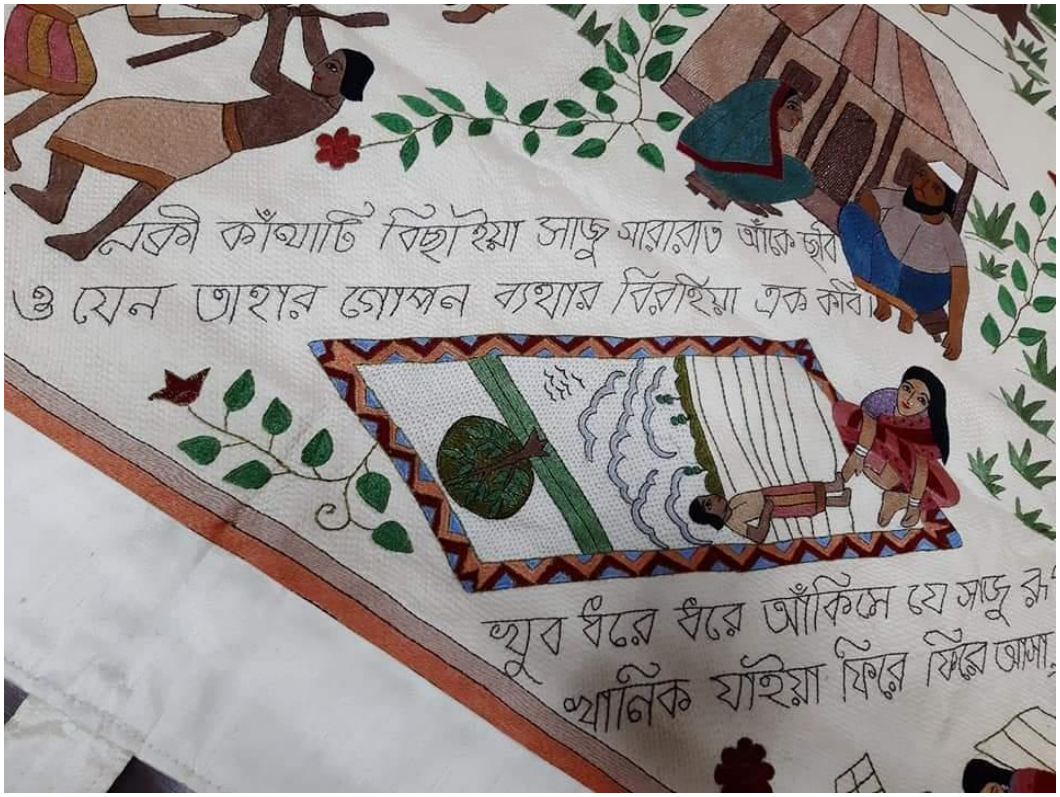

চিত্র: ৮৬- নকশি কাঁথার মাঠের দৃশ্য

চিত্র: ৮৭- লাল রঙের জমিনের বিছানার চাদর

চিত্র: ৮৮- ১৩টি মোটিফ বিশিষ্ট দেওয়ালসজ্জা

চিত্র: ৮৯- লাল শাড়ি

চিত্র: ৯০- হলুদ শাড়ি

চিত্র: ৯১- গোলাপি শাড়ি

চিত্র: ৯২- ঘিয়ে শাড়ি

চিত্র: ৯৩- কালো শাড়ি

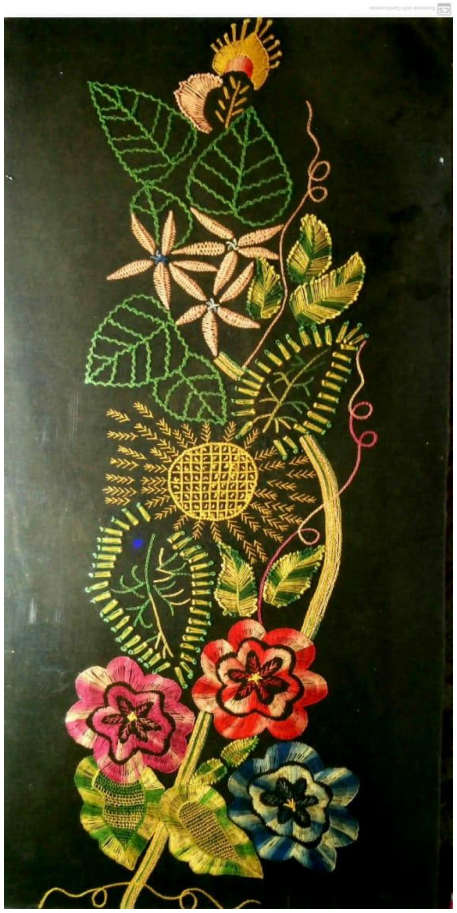

চিত্র: ৯৪- কালো জমিনে ১৩টি ভিন্ন ফোঁড়ের দেওয়ালসজ্জা

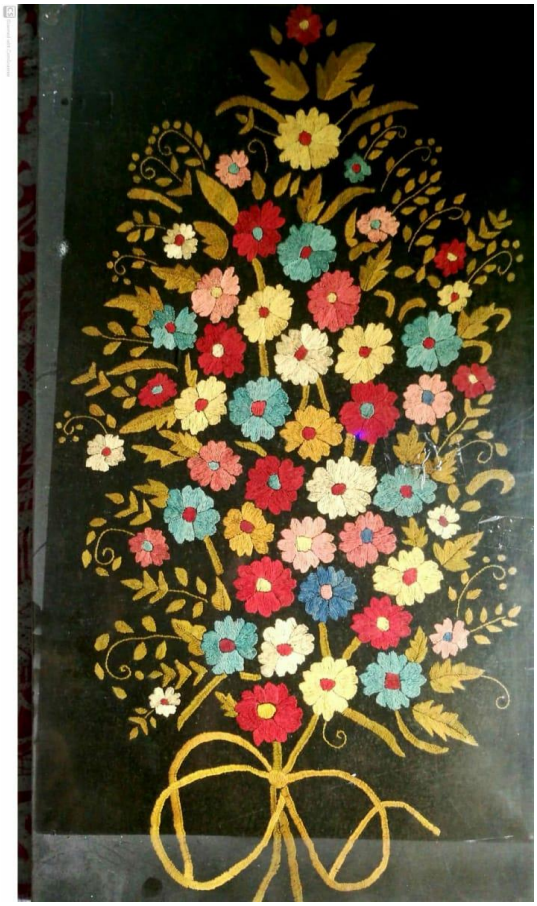

চিত্র: ৯৫- ফ্লোরাল মোটিফের দেওয়ালসজ্জা

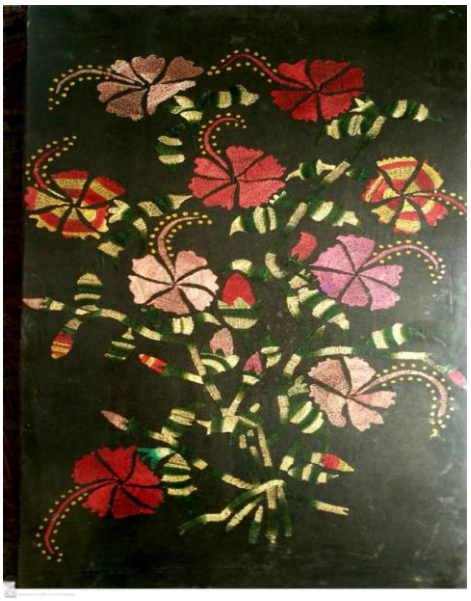

চিত্র: ৯৬- জবা ফুলের দেওয়ালসজ্জা

চিত্র: ৯৭- গোলাপ ফুলের দেওয়ালসজ্জা

চিত্র: ৯৮- চটের উপরে দেওয়ালসজ্জা

চিত্র: ৯৯- চটের উপর দোয়েল পাখির দেওয়ালসজ্জা

চিত্র: ১০০- চটের কার্পেট

চিত্র-১০১- মহুয়ার প্রতিষ্ঠানে (সুঁই-ফোঁড় বুটিকস) তৈরি সূচিশিল্প

চিত্র-১০২- সুঁই- ফোঁড় বুটিকসের ৩ জন কর্মী

চিত্র: ১০৩-বেবির তৈরি সূচি শিল্প

চিত্র: ১০৪- সূচিশিল্পের অবদান রাখায় স্বীকৃতি

কাঁথা শাড়ি চাদরে হাতের কাজ করে স্বাবলম্বী চৌগাছার মহিলারা

চিত্র: ১০৫-আলোকচিত্র, দৈনিক নয়া দিগন্ত

চিত্র: ১০৬- ছোঁয়া হস্তশিল্পের সূচিকর্মী

চিত্র: ১০৭-করুণার আঁকা নকশা

চিত্র: ১০৮- কাপড়ে নকশা আঁকার সরঞ্জাম ও পদ্ধতি

চিত্র: ১০৯-তটিনী সাহার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সূচিশিল্প

চিত্র: ১১০-সাজু–রুপাই-এর কাহিনীর নকশি কাঁথা

চিত্র:১১১- তটিনী সাহার বাড়ি

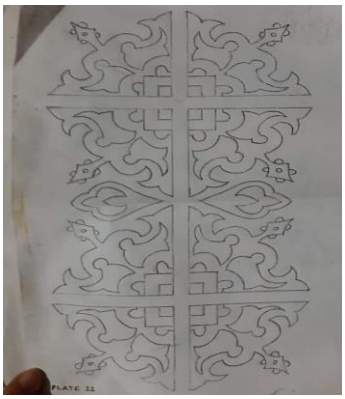

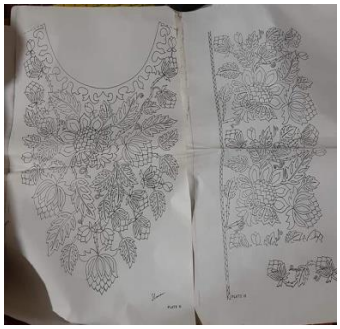

চিত্র:১১২- রাফিয়ার সংগ্রহে থাকা বিভিন্ন ধরনের নকশার প্লেট

চিত্র:১১৩- এপ্লিকের চাদর

চিত্র:১১৪-আত্মীয়ের বিয়েতে উপহার দেবার জন্য তৈরি বিছানার চাদর

চিত্র: ১১৫-জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সাতক্ষীরা- প্রশিক্ষণরত

চিত্র: ১১৬-বিভিন্ন ফোঁড় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ

চিত্র: ১১৭- ট্রেড প্রশিক্ষক অফিস প্রধান মর্জিনা রহমানের তত্ত্বাবধায়নে তৈরিকৃত পণ্যসমূহ

চিত্র: ১১৮- বিভিন্ন ধরনের নকশা

চিত্র: ১১৯- ঋ-শিল্পী প্রতিষ্ঠানের হস্তশিল্প বিভাগ

চিত্র: ১২০- ঋ-শিল্পীর প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ

চিত্র: ১২১-হস্তশিল্প বিভাগে কর্মীদের কাজ

চিত্র: ১২২-ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং ইউরোপিয়ান নকশার সূচিপণ্য

চিত্র: ১২৩-সূচিনকশার বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ

চিত্র: ১২৪-জরি–চুমকির সূচিপণ্য

চিত্র: ১২৫- মোঃ আমিনুল ইসলামের সৃষ্ট সূচিশিল্প

চিত্র: ১২৬- মহুয়ার তৈরি সূচিশিল্প

চিত্র: ১২৭- মারিয়ার তৈরি সূচিপণ্য

চিত্র: ১২৮- সূচি নকশায় বিপরীত রঙের ব্যবহার

চিত্র: ১২৯- দেওয়াল সজ্জা

চিত্র: ১৩০- সাদা রঙের জমিনে বৈচিত্রময় রঙের ব্যবহার

চিত্র: ১৩১- শেডের DMC সুতা

চিত্র: ১৩২- সূচিনকশায় শেড সুতার ব্যবহার

চিত্র: ১৩৩- রাবেয়া খাতুনের তৈরি শাল, সময়: ১৯৮৫, স্থান: কুষ্টিয়া

ক) আলপনা খ) সাদৃশ্যপূর্ণ নকশা

চিত্র: ১৩৪- ক) আলপনা ও খ) আলপনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নকশি কাঁথার নকশা

চিত্র: ১৩৫- সূচিনকশায় বিভিন্ন মোটিফ

চিত্র: ১৩৬- সূচিনকশায় গোলাকার ভারসাম্য

চিত্র: ১৩৭- মোটিফের পুনরাবৃত্তি ছন্দ

চিত্র: ১৩৮- গোলক ধাঁধা পাড়ের কাঁথা, শিল্পী: জাহানারা খাতুন, সময়: ১৯৯৫, স্থান: কুষ্টিয়া

চিত্র: ১৩৯- ফুলের নকশার মাঝে তাগা বা পাড়ের নকশা

চিত্র: ১৪০- গ্রামীণ পটভূমির নকশা

চিত্র: ১৪১- সূচি নকশায় জ্যামিতিক হারের ব্যবহার

চিত্র: ১৪২- শাড়িতে জামদানি নকশার (করলা পাড়) অনুকরণ

চিত্র: ১৪৩- চটের উপরে ধর্মীয় নকশা

(ক) (খ)

চিত্র: ১৪৪- (ক) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ, খ) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: শাহীন সুলতানা, সময়কাল: ১৯৯৯, স্থান: খুলনা, পাইকগাছা

(ক) (খ)

চিত্রঃ ১৪৫- ক) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পীঃ বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ,খ) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পীঃ শাহীন সুলতানা, সময়কালঃ ১৯৯৬, স্থানঃ খুলনা, পাইকগাছা

চিত্রঃ ১৪৬- নাতীর জন্য দাদীর তৈরি কাঁথা, সময়কাল ১৯৮৫-১৯৮৭, স্থানঃ কুষ্টিয়া

চিত্রসূচী

ক্রমিক নম্বর	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
চিত্র: ০১	বাংলাদেশের মানচিত্র [চিত্র: ক) ১৯৬০খ্রি. সময়ের মানচিত্রে খুলনা বিভাগ চিত্র: খ) বর্তমান সময়ের মানচিত্রে খুলনা বিভাগ]	৬৯
চিত্র: ০২	৩২৩ খ্রি.পূ. সময়ের গঙ্গারিডাই রাজ্যের মানচিত্র	৬৯
চিত্র: ০৩	প্রস্তর যুগের সুচ	৭০
চিত্র: ০৪	সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত সুচ	৭০
চিত্র: ০৫	সিন্ধু সভ্যতার মূর্তির-(যাজক রাজা) পরিচ্ছদের নকশার সাথে সূচিশিল্পের সাদৃশ্য	৭০
চিত্র: ০৬	৬০০খ্রি. পূ. ভারতের মানচিত্র	৭০
চিত্র: ০৭	প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের ম্যানুস্ক্রিপ্টে অঙ্কিত চিত্র	৭১
চিত্র: ০৮	সাতগাঁও- এর লেপ কাঁথা	৭১
চিত্র: ০৯	ইন্দো-পর্তুগীজ কাঁথা	৭১
চিত্র: ১০	ইন্দো-পর্তুগীজ কাঁথায় মৎসকুমারির নকশা	৭২
চিত্র: ১১	লেডি, কার্জনের বিখ্যাত পিকক ড্রেস	৭২
চিত্র: ১২	রেজাই	৭২
চিত্র: ১৩	কশিদা	৭২
চিত্র: ১৪	১৯ শতকে ঢাকায় প্রাপ্ত কশিদা	৭৩
চিত্র: ১৫	মুঘল আমলের শিকারের কোট	৭৩
চিত্র: ১৬	ঔধ রাজ্যের রাণীর পোশাক	৭৩
চিত্র: ১৭	১৯৬৬ সালে তৈরি একটি সূচিশিল্প	৭৪
চিত্র: ১৮	আনুঃ ১৯ শতকে তৈরি, 'শতদল পদ্মমোটিভ' ও 'জীবন বৃক্ষ' মোটিফের সুজনি কাঁথা ঢাকা বিসিকে সংগৃহিত	৭৪
চিত্র: ১৯	আড়ং-এর সূচিপণ্য	৭৪
চিত্র: ২০	জয়িতার সূচিপণ্য	৭৫
চিত্র: ২১	সূচিনকশায় পশু-পাখির মোটিফ	৭৫
চিত্র: ২২	বিভিন্ন ধরনের পদ্ম মোটিফ	৭৫
চিত্র: ২৩	সূচিকলায় গ্রামীণ চাল–চিত্র	৭৬
চিত্র: ২৪	জীবনবৃক্ষ মোটিফ	৭৬
চিত্র: ২৫	সূচিশিল্পে ইসলামিক মোটিফের ব্যবহার	৭৬
চিত্র: ২৬	সূচিশিল্পে বিয়ের উৎসবের চিত্র	৭৭
চিত্র: ২৭	বিভিন্ন নকশায় মেয়েলি আবেগের প্রতিচ্ছবি	৭৭
চিত্র: ২৮	সূচিনকশায় আলপনা মোটিফ	৭৭
চিত্র: ২৯	সূচিশিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য মোটিফ	৭৮

চিত্র: ৩০	বর্তমানে বহুল প্রচলিত নকশি চাদর	৭৮
চিত্র: ৩১	সূচিশিল্পের জন্য ব্যবহৃত কাপড়	৭৮
চিত্র: ৩২	বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের কুশন কভার	৭৯
চিত্র: ৩৩	সিল্কের শাড়িতে সূচিকাজ	৭৯
চিত্র: ৩৪	চটের ব্যাগে সূচিনকশা	৭৯
চিত্র: ৩৫	সূচিকাজের গহনা	৭৯
চিত্র: ৩৬	সূচিকাজের উপযোগী চট	৭৯
চিত্র: ৩৭	সূচিশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সুতা	৮০
চিত্র: ৩৮	বাজারে প্রচলিত সূচিশিল্পের সুচ	৮০
চিত্র: ৩৯	প্রাচীন যুগের সুচ	৮০
চিত্র: ৪০	যশোর স্টিচ ৮নং সুচ	৮০
চিত্র: ৪১	চটের জমিনে সূচিকাজের উপযোগী সুচ	৮০
চিত্র: ৪২	সূচিনকশার আনুষঙ্গিক উপকরণ	৮০
চিত্র: ৪৩	সূচিকাজে ফ্রেমের ব্যবহার	৮১
চিত্র: ৪৪	আধুনিক ফোঁড়সমূহ	৮১
চিত্র: ৪৫	চেইন ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৪৬	রান ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৪৭	কেবল ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৪৮	আঁটি বাঁধা ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৪৯	ডাল ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৫০	ভরাট ফোঁড়	৮১
চিত্র: ৫১	লেজি-ডেইজি ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫২	ক্রস ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫৩	হেরিংবোন ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫৪	ফেদার ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫৫	ফ্রেঞ্চ নট	৮২
চিত্র: ৫৬	মাকড়শার জাল	৮২
চিত্র: ৫৭	বোতামঘর ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫৮	হুইল ফোঁড়	৮২
চিত্র: ৫৯	কয়েক প্রকার ফোঁড়ের মাধ্যমে একটি কুশন কভারের নকশা	৮২
চিত্র: ৬০	বিভিন্ন ধরনের নকশি পাঁড়	৮৩
চিত্র: ৬১	এপ্লিক	৮৩
চিত্র: ৬২	কাঁটাকাজ	৮৩
চিত্র: ৬৩	মেশিন এমব্রয়ডারি	৮৩
চিত্র: ৬৪	নকশার কাগজ	৮৩
চিত্র: ৬৫	টাইডাই বা ব্লকের থ্রি-পিসে সুই সুতার নকশা	৮৪
চিত্র: ৬৬	সুতি বা তাঁতের সুতার নকশা	৮৪
চিত্র: ৬৭	যশোর স্টিচ	৮৪

চিত্র: ৬৮	সাতক্ষীরার সূচিনকশায় পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব	৮৪
চিত্র: ৬৯	চামড়ার ব্যাগের সাথে সূচিনকশা	৮৫
চিত্র: ৭০	চুমকি-গ্লাসের কাজের সূচিশিল্প	৮৫
চিত্র: ৭১	কলকা মোটিফের শাল	৮৫
চিত্র: ৭২	পাঞ্জাবীতে গুজরাটি ফোঁড়	৮৫
চিত্র: ৭৩	নকশি চাদর	৮৫
চিত্র: ৭৪	ফুলকারী নকশার আদলে সূচিশিল্প	৮৫
চিত্র: ৭৫	নকশি চাদর	৮৫
চিত্র: ৭৬	দূর্জানি কাঁথা বা থলে	৮৬
চিত্র: ৭৭	লেপ কাঁথা	৮৬
চিত্র: ৭৮	আরশিলতা	৮৬
চিত্র: ৭৯	লেপ কাঁথা	৮৬
চিত্র: ৮০	লেপ কাঁথা	৮৬
চিত্র: ৮১	আসন কাঁথা	৮৬
চিত্র: ৮২	১৯৯০-১৯৯২ সালে করা কাজ	৮৭
চিত্র: ৮৩	ময়ূয়ের নকশার প্লেট	৮৭
চিত্র: ৮৪	তেলাপিয়া মাছের চিত্র	৮৭
চিত্র: ৮৫	শাড়ির আঁচলে বিভিন্ন পাড় ও মোটিফ	৮৭
চিত্র: ৮৬	নকশি কাঁথার মাঠের দৃশ্য	৮৮
চিত্র: ৮৭	লাল রঙের জমিনের বিছানার চাদর	৮৯
চিত্র: ৮৮	১৩টি মোটিফ বিশিষ্ট দেওয়ালসজ্জা	৮৯
চিত্র: ৮৯	লাল শাড়ি	৯০
চিত্র: ৯০	হলুদ শাড়ি	৯০
চিত্র: ৯১	গোলাপি শাড়ি	৯০
চিত্র: ৯২	ঘিয়ে শাড়ি	৯০
চিত্র: ৯৩	কালো শাড়ি	৯০
চিত্র: ৯৪	কালো জমিনে ১৩টি ভিন্ন ফোঁড়ের দেওয়ালসজ্জা	৯১
চিত্র: ৯৫	ফ্লোরাল মোটিফের দেওয়ালসজ্জা	৯১
চিত্র: ৯৬	জবা ফুলের দেওয়ালসজ্জা	৯১
চিত্র: ৯৭	গোলাপ ফুলের দেওয়ালসজ্জা	৯১
চিত্র: ৯৮	চটের উপরে দেওয়ালসজ্জা	৯২
চিত্র: ৯৯	চটের উপর দোয়েল পাখির দেওয়ালসজ্জা	৯২
চিত্র: ১০০	চটের কার্পেট	৯২
চিত্র: ১০১	মহুয়ার প্রতিষ্ঠানে (সুঁই-ফোঁড় বুটিকস) তৈরি সূচিশিল্প	৯২
চিত্র: ১০২	সুঁই- ফোঁড় বুটিকসের ৩ জন কর্মী	৯৩
চিত্র: ১০৩	বেবির তৈরি সূচি শিল্প	৯৩
চিত্র: ১০৪	সূচিশিল্পের অবদান রাখায় স্বীকৃতি	৯৩
চিত্র: ১০৫	আলোকচিত্র, দৈনিক নয়া দিগন্ত	৯৪

চিত্র: ১০৬	ছোঁয়া হস্তশিল্পের সূচিকর্মী	৯৪
চিত্র: ১০৭	করুণার আঁকা নকশা	৯৪
চিত্র: ১০৮	কাপড়ে নকশা আঁকার সরঞ্জাম ও পদ্ধতি	৯৪
চিত্র: ১০৯	তটিনী সাহার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সূচিশিল্প	৯৫
চিত্র: ১১০	সাজু–রুপাই-এর কাহিনীর নকশি কাঁথা	৯৫
চিত্র: ১১১	তটিনী সাহার বাড়ি	৯৬
চিত্র: ১১২	রাফিয়ার সংগ্রহে থাকা বিভিন্ন ধরনের নকশার প্লেট	৯৬
চিত্র: ১১৩	এপ্লিকের চাদর	৯৬
চিত্র: ১১৪	আত্মীয়ের বিয়েতে উপহার দেবার জন্য তৈরি বিছানার চাদর	৯৬
চিত্র: ১১৫	জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সাতক্ষীরা- প্রশিক্ষণরত	৯৭
চিত্র: ১১৬	বিভিন্ন ফোঁড় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ	৯৭
চিত্র: ১১৭	ট্রেড প্রশিক্ষক অফিস প্রধান মর্জিনা রহমানের তত্ত্বাবধায়নে তৈরিকৃত পণ্যসমূহ	৯৮
চিত্র: ১১৮	বিভিন্ন ধরনের নকশা	৯৮
চিত্র: ১১৯	ঋ-শিল্পী প্রতিষ্ঠানের হস্তশিল্প বিভাগ	৯৯
চিত্র: ১২০	ঋ-শিল্পীর প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ	৯৯
চিত্র: ১২১	হস্তশিল্প বিভাগে কর্মীদের কাজ	৯৯
চিত্র: ১২২	ঐতিহ্যবাহী নকশা এবং ইউরোপিয়ান নকশার সূচিপণ্য	৯৯
চিত্র: ১২৩	সূচিনকশার বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ	১০০
চিত্র: ১২৪	জরি–চুমকির সূচিপণ্য	১০০
চিত্র: ১২৫	মোঃ আমিনুল ইসলামের সৃষ্ট সূচিশিল্প	১০০
চিত্র: ১২৬	মহুয়ার তৈরি সূচিশিল্প	১০০
চিত্র: ১২৭	মারিয়ার তৈরি সূচিপণ্য	১০১
চিত্র: ১২৮	সূচি নকশায় বিপরীত রঙের ব্যবহার	১০১
চিত্র: ১২৯	দেওয়াল সজ্জা	১০১
চিত্র: ১৩০	সাদা রঙের জমিনে বৈচিত্রময় রঙের ব্যবহার	১০১
চিত্র: ১৩১	শেডের DMC সুতা	১০১
চিত্র: ১৩২	সূচিনকশায় শেড সুতার ব্যবহার	১০২
চিত্র: ১৩৩	রাবেয়া খাতুনের তৈরি শাল, সময়: ১৯৮৫, স্থান: কুষ্টিয়া	১০২
চিত্র: ১৩৪	ক) আলপনা ও খ) আলপনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নকশি কাঁথার নকশা	১০২
চিত্র: ১৩৫	সূচিনকশায় বিভিন্ন মোটিফ	১০৩
চিত্র: ১৩৬	সূচিনকশায় গোলাকার ভারসাম্য	১০৩
চিত্র: ১৩৭	মোটিফের পুনরাবৃত্তি ছন্দ	১০৩
চিত্র: ১৩৮	গোলক ধাঁধাঁ পাড়ের কাঁথা, শিল্পী: জাহানারা খাতুন, সময়: ১৯৯৫, স্থান: কুষ্টিয়া	১০৩
চিত্র: ১৩৯	ফুলের নকশার মাঝে তাগা বা পাড়ের নকশা	১০৩
চিত্র: ১৪০	গ্রামীণ পটভূমির নকশা	১০৩
চিত্র: ১৪১	সূচিনকশায় জ্যামিতিক হারের ব্যবহার	১০৪

চিত্র: ১৪২	শাড়িতে জামদানি নকশার(করলা পাড়) অনুকরণ	১০৪
চিত্র: ১৪৩	চটের উপরে ধর্মীয় নকশা	১০৪
চিত্র: ১৪৪	ক) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ, খ) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: শাহীন সুলতানা, সময়কাল: ১৯৯৯, স্থান: খুলনা, পাইকগাছা	১০৪
চিত্র: ১৪৫	ক) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ, খ) দেওয়াল সজ্জা, শিল্পী: শাহীন সুলতানা, সময়কাল: ১৯৯৬, স্থান: খুলনা, পাইকগাছা	১০৫
চিত্র: ১৪৬	নাতীর জন্য দাদীর তৈরি কাঁথা, সময়কাল ১৯৮৫-১৯৮৭, স্থান: কুষ্টিয়া	১০৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অতুল চন্দ্র রায়, সুরঞ্জনা সান্যাল, *ভারতের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরী, কোলকাতা-৭০০০৭৩, জানুয়ারি ২০১৩।

এ এস এম আতিকুর রহমান, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১১০০, জুলাই ২০০৫।

এবনে গোলাম সামাদ, *মানুষ ও তার শিল্পকলা*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা-১০০০, জুন ২০০৬।

ওয়াকিল আহমেদ, *লোককলা প্রবন্ধাবলী*, গতিধারা, ঢাকা-১১০০, আগস্ট ২০০৫।

জগমোহন মুখোপাধ্যায়, *গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতান, জানুয়ারি ১৯৯২।

জসীম উদ্‌দীন, *নক্সী কাঁথার মাঠ*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৭, মার্চ ২০১৩।

ড. আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, মে ২০০৩।

ড. আব্দুস সাত্তার, *বাংলাদেশের নতোন্নত দারুশিল্প*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১০০০, আগস্ট ২০০৬।

ড. আবু তাহের, *বাংলাদেশের নকশিকাঁথা*, প্রকাশক: শাহনাজ পারভীন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, *বাংলার মুখ*, চয়ন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২।

ড. এ. কে.এম. সালাহউদ্দিন, *নন্দনতত্ত্ব*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা-১১০০, জুলাই ২০১৫।

ড. প্রদীপ কুমার নন্দী, *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

ড. প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিপনি, কলিকাতা-৭০০০৩৩, ডিসেম্বর ২০০৪।

ড. মাযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, জানুয়ারি ১৯১৩।

ড. মোঃ আবু তাহের, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, অনু প্রকাশনী, ঢাকা-১২০৫, আগস্ট-২০০৮।

ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *ইতিহাস চর্চা ও গবেষণা পদ্ধতি*, অর্পূব প্রকাশনী, ঢাকা, আগস্ট ২০১৭।

ড. মোঃ শাহজাহান, *বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ১২০৪ খ্রি.)*, তূর্য প্রকাশন, ঢাকা-১১০০, মার্চ ২০১৮।

ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, প্রতিভা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩।

তোফায়েল আহমেদ, *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৬।

নিত্যানন্দ ভকত, *নকশার গঠনশৈলী*, দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০০০৯, এপ্রিল ২০১২।

ফজলুল হক মন্টু, *চারু ও কারুকলা*, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারি ২০১৪।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, আশ্বিন-১৩৮৬।

বিলকিস বেগম, *চাঁপাইনবাবগঞ্জের সূচিশিল্প*, বাংলা একামেডী, ঢাকা-১০০০, জানুয়ারি ২০০৬।

বুলবন ওসমান, *সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব*, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ] ঢাকা-১, জুলাই ১৯৭৭।

বুলবন ওসমান, *নন্দনতত্ত্বের গোড়ার কথা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, জুন ২০০৯।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, *লোকশিল্প*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-১২০৭, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

রায়হান আরা জামান, রিদওয়ানুল মসরুর, *শিক্ষা–গবেষণার সহজপাঠ*, আর্দশ, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারি -২০১১।

লুইস হেনরি মর্গান, (অনুবাদক: বুলবন ওসমান), *আদিম সমাজ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১১০০, জানুয়ারি ২০১৭।

শফিকুল ইসলাম, *প্রাচ্যরীতির শিল্প*, শিল্পলোক, চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৮৯।

শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা খুলনা*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ২০১৪।

শীলা বসাক, *বাংলার নকশি কাঁথা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কোলকাতা-৭০০০০৯, আগস্ট ২০১৬।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত বিশ্ব ভারতী*, কলিকাতা-১৭, পৌষ ১৪০২।

সৈয়দ আলি আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০, জুন-২০০৪।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *নন্দনতত্ত্ব*, সদেশ, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০১১।

হাশেম খান, *চারুকলা পাঠ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা–১০০০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

Frances Melanie Obst, *Art and Design in Home Living*, The Macmillan Company, New York, 1963.

Helen Marie Evans, Carla Davis Dumesnil, *An Invitation to Design*, Macmillan Publishing Co.Inc. New York, USA, 1973.

Kathryn Mckelury & Jamine Munslow, *Fashion Design: Proces, Innovation & Practice*, Blackwell Science Ltd. USA, 2005.

M. Rose Collins, B.S, Olivc L. Riley, M.A, *Art Appereciation*, Harecourt, Brace and Company, Chicago, USA, 1931.

Naksha, *A Collection of Designs of Bangladesh*, Design Centre, BSCIC, Dacca, October 1981.

Patrick J Finn, *Quilts of India- Timeless textile*, Niyogi Books, New Delhi, India, 2014.

ম্যাগাজিন, ক্যাটালগ, সাময়িকী ও দৈনিক সংবাদপত্র

পাক্ষিক আনন্দ ধারা, দ্য ডেইলি স্টার, ২০ বর্ষ ৪৫৭ সংখ্যা, ১৬-৩১ অক্টোবর ২০১৭।

Cross-Stitch, Book, Arora Book Company, Delhi-110006.

Star Weekend, The Daily Star, 18 October 2019.

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, কাঁথার কথা, ২৯ নভেম্বর, ২০১৮।

ঋ-শিল্পী বিক্রয় প্রতিনীধি, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা, ৩০ অক্টোবর, ২০২১।

তটিনী এলিজাবেথ সাহা, ছোঁয়া হস্তশিল্প, যশোর, ২৭ অক্টোবর, ২০২০।

দিবা ইসলাম, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, সাতক্ষীরা, ২০ অক্টোবর, ২০২০।

দৃষ্টি বিশ্বাস, ছাত্রী, মাগুরা সদর, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

নূরুন নাহার লিলি, লিলি বুটিকস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, তুঁতপাড়া, খুলনা, ২৮ অক্টোবর, ২০২০।

পৃথা, ছাত্রী, বাঘারপাড়া, যশোর, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

ফারহানা সুলতানা মুক্তা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, ২১ ডিসেম্বর, ২০২১।

বেগম শিরিন শাহনেওয়াজ (সূচিশিল্পী), পলাশপোল, সাতক্ষীরা, ২৮ মার্চ, ২০২২।

মর্জিনা রহমান, ট্রেড প্রশিক্ষক, মহিলা সংস্থা, সাতক্ষীরা, ২১ অক্টোবর, ২০২০।

মহুয়া আক্তার তামান্না, সুঁই–ফোঁড় বুটিকস এন্ড ট্রেনিং, ময়লাপোতা, খুলনা, ২৮ অক্টোবর, ২০২০।

মুনমুন, বাগেরহাট সদর, ২৮ নভেম্বর ২০২১।

রাফিয়া, সূচিকর্মী, লাবসা, ঝাউতলা, সাতক্ষীরা, ২৩ অক্টোবর, ২০২০।

রুবিনা আক্তার আইভি, সৃষ্টি হস্তশিল্প এন্ড বুটিক, যশোর, ২৭ অক্টোবর, ২০২০।

রুমকি, মেহেরপুর সদর, ২৯ নভেম্বর ২০২১।

শারমিন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, লোহাগড়া, নড়াইল, ৪ জানুয়ারি, ২০২২।

শাহানা পারভীন বেবি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, খান জাহান আলী রোড, খুলনা, ২৮ অক্টোবর, ২০২০।

শাহীন সুলতানা, (সূচিশিল্পী), কল্যাণপুর,ঢাকা, ২৯ মে, ২০২২।

সাদিয়া ফারজানা মহুয়া, প্রভাষক (সূচিশিল্পী), কুষ্টিয়া সদর, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

সেলিনা বেগম, শিক্ষক, এন এস রোড, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

ওয়েব সাইট

আমিনুলের নকশি ভূবন,
https://www.ajkerpatrika.com/165690/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%A8

এঞ্জেলা গোমেজ, https://www.thedailystar.net/supplements/star-lifetime-awardees-2016/dr-angela-gomes-212809

কারুপল্লী, ঢাকা, বাংলাদেশ। https://yellow.place/en/karupalli-%E0%A5%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A5%A4-dhaka-bangladesh

গঙ্গাঋদ্ধি,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%8B%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BF

জয়িতা ফাউন্ডেশন, https://joyeeta.portal.gov.bd/

জাতীয় মহিলা সংস্থা, http://www.jms.gov.bd/

ধারালো সুইয়ের বিস্তৃত ইতিহাস,
https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2/%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8?amp

পান্ডুরাজার ঢিবি,
https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%81_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%A2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন,
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%93_%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8#:~:text=%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%20%E0%A6%93%20%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0%20%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6,%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%20%E0%A6%8F%E0%A6%9F%E0%A6%BF%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A5%A4

ব্রিটিশ ভারত,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4

মহাজনপদ,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A6%A6

মুঘল সাম্রাজ্য, https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%98%E0%A6%B2

মুসলমানদের ভারত বিজয়,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%AF%E0%A6%BC

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, http://dyd.gov.bd/

লেডি কার্জনের পিকক ড্রেস, https://en.wikipedia.org/wiki/Peacock_dress_of_Lady_Curzon

লৌহ যুগ,
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8C%E0%A6%B9_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%97

হাজার কর্মীর 'আড়ং',
https://www.banglatribune.com/amp/lifestyle/378999/%E0%A7%AC%E0%A7%AB-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%82

https://en.wikipedia.org/wiki/Prajnaparamita

https://wovensouls.com/products/1516-rare-antique-dhaka-kashida-silk-embroidery

https://collections.vam.ac.uk/item/O16066/hunting-coat/

https://in.pinterest.com/pin/121667627403232605/

https://www.luigi-bevilacqua.com/en/flowers-art-nouveau/